গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৯ বর্ষ ২১ সংখ্যা ১২ - ১৮ জানুয়ারি ২০০৭ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

নন্দীগ্রামে কৃষক হত্যার প্রতিবাদে ধর্মঘটে স্তব্ধ পশ্চিমবঙ্গ

টাটা-সালিম-আম্বানিদের দাসত্ব করছে সিপিএম। মনিবদের স্বার্থরক্ষায় তারা যে ষোল আনা নিয়োজিত তার প্রমাণ দিতেই নন্দীগ্রামে তারা গণহত্যা ঘটাল। সিপিএম ও তার সরকারের এই বেপরোয়া স্বৈরাচারী ভূমিকার বিরুদ্ধে রাজ্যের জনগণ আবারও রায় দিলেন সর্বাত্মকভাবে। ৮ জানুয়ারি ২৪ ঘণ্টার সাধারণ ধর্মঘট ডেকেছিল এস ইউ সি আই। জনগণের সর্বাত্মক সমর্থনে তা সফল হয়েছে। এ জন্য জনগণকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেছেন, কৃষিজমি দখলের বিরোধিতায় অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে যে চারটি ধর্মঘট হয়ে গেল তা এক কথায় অভূতপূর্ব। এই ঘটনাই প্রমাণ করে সর্বস্তরের জনগণ দলমত নির্বিশেষে সরকারের এই নীতির বিরোধিতা করছে। এ সরকারের যদি ন্যূনতম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থাকত, তাহলে সিঙ্গুরের ঘটনার পরই নীতি পাল্টাত। তা না করে তারা নন্দীগ্রামে হাত বাড়াল। ক্ষমতার দম্ভে সিপিএম নেতৃত্ব ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। রাজ্যের জনগণকে তাদের সম্পত্তি বলে ধরে নিয়েছে। নেতারা ভাবছেন, তাঁরা যা বলবেন, যা করবেন, জনগণ মাথা পেতে তাই মেনে নেবে। সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম তাদের এই ঔদ্ধত্যের জবাব দিয়েছে। রাজ্যের জনগণও ধর্মঘট সফল করার মধ্য দিয়ে এর যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছে।

৮ জানুয়ারি ধর্মঘটের প্রচারে এস ইউ সি আই কর্মীরা পুলিশ ও সিপিএম উভয়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে মিছিলে সিপিএম গুণ্ডাবাহিনী আক্রমণ করেছে। মেদিনীপুর শহরে সিপিএম নেতারা পুলিশের লাঠি নিয়ে আমাদের কর্মীদের মেরেছে। রাজ্যে এস ইউ সি আই-এর ৩৫৯ জন গ্রেপ্তার হয়েছে, ২০ জন আহত, গুরুতর আহত ৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। কলকাতার হাজরা মোড়ে মহিলাদের চুলের মুঠি ধরে পুলিশ ভ্যানে তুলেছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বনধ্ সমর্থকদের উপর পুলিশ এবং সিপিএম বাহিনী আক্রমণ নামিয়ে এনেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, ব্রিটিশ আমলে, কংগ্রেস শাসনে গণআন্দোলন দমনে পুলিশ-মিলিটারি ব্যবহার করা হত। সিপিএম এখন পুলিশের সাথে ক্রিমিন্যাল বাহিনী নিয়োগ করছে। এই ফ্যাসিবাদী প্রবণতা

আটের পাতায় দেখুন

কৃষিজমি দখল করলে সর্বত্র প্রতিরোধ করবে জনগণ

৪ জানুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক প্রভাস ঘোষ নন্দীগ্রাম সহ রাজ্য জুড়ে জমি দখলের বিরুদ্ধে আন্দোলন সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। নন্দীগ্রাম সম্পর্কে প্রথমেই তিনি বলেন, ''নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণের নোটিশ জারি করা হয়নি — মুখ্যমন্ত্রীর এ বক্তব্য অসত্য। বাস্তবে হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছিল কোন্ কোন্ মৌজার জমি অধিগ্রহণ করা হবে। এই বিজ্ঞপ্তিকে ভিত্তি করে জনগণের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এমনিতে রাজ্যের যেখানেই কৃষিজমি দখল করা হচ্ছে সেখানেই মানুষের মধ্যে উদ্বেগ, আশঙ্কা, উত্তেজনা প্রবলভাবে বিরাজ করছে। নন্দীগ্রামেও সেই অবস্থা চলছিল। আমাদের দল এস ইউ সি আইয়ের পক্ষ থেকে আমরা একটি সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য গ্রামে গ্রামে ভলান্টিয়ার বাহিনী এবং গণকমিটি গড়ে তুলেছিলাম। গত ৩ জানুয়ারি হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এই নোটিশ একটা ব্যাপক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে। স্বভাবতই কাদের জমি এই নোটিশের আওতায় পড়েছে তা জানতে গ্রামবাসীরা ব্যগ্র হয় এবং দলে দলে কালীচরণপুর পঞ্চায়েত অফিসে যায়। এই পঞ্চায়েতটি সিপিএম কন্ট্রোল করে। গ্রামবাসীদের ভীড় দেখে পঞ্চায়েতের কর্তাব্যক্তিরা থানায় খবর দেয়। আরেকটা জিনিসও নন্দীগ্রামের মানুষকে আশঙ্কিত করে তুলেছিল। নন্দীগ্রাম থানায় এবং হাইস্কুলে বাইরে থেকে বহু পুলিশ এনে রাখা হয়েছিল। ফলে, এখনই জমি দখল করে নেওয়া হবে — এরকম একটা আতঙ্ক মানুষের মধ্যে দেখা দেয় এবং বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। সেসময় আমাদের দলের স্থানীয় নেতা কমরেড নন্দ পাত্র ও অন্যান্য কর্মীরা সেখানে গিয়ে এই জনতাকে মিছিলে সংগঠিত করে শান্ত করেন যাতে কোনরকম উত্তেজনা সৃষ্টি না হয়। পঞ্চায়েত অফিস থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দুরে গড়চক্রবেড়িয়া ভূতারমোড়ে জনতাকে নিয়ে আসা হয়। এই সময় পুলিশের জিপগাড়ি পঞ্চায়েত অফিস থেকে ফিরছিল। পুলিশের গাড়ি যাতে চলে যেতে পারে সেজন্য রাস্তাও ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেইসময় পুলিশ জিপ থেকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করে। এর ফলে লোকজন উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তখন পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এতে উত্তেজনা তীব্র হয় এবং পুলিশ গুলি চালায়। এতে চারজন গুরুতর সহ অনেকেই আহত হয়। অবস্থা বেগতিক বুঝে পুলিশ ঐ জিপ নিয়ে যখন দ্রুতবেগে পালাচ্ছিল সে সময় একটা ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা মারে এবং ল্যাম্পপোস্টের তার ছিড়ে শর্টসার্কিট হয়ে গাড়িতে আগুন লেগে যায়। সুতরাং জনতা পুলিশের গাড়ি পোড়ায়নি।

প্রশাসন ও শাসকদলের পক্ষ থেকেই কীভাবে প্ররোচনা সৃষ্টি হয়েছে তার প্রমাণ স্বরূপ ৫ জানুয়ারির সকালের ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, নন্দীগ্রামের যেসব মানুষ মেটিয়াবুরুজে কাজ করে, তারা ঈদের পর আজ সকালে যখন বাসে কর্মস্থলে ফিরছিল তখন নন্দকুমার থানার ভবানীপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে পুলিশ তাদের বারো জনকে অ্যারেস্ট করে। পুলিশ এটা চায়নি। স্থানীয় সিপিএম নেতারা চাপ দিয়ে এটা করায়। কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, এই খবর যখন কলকাতায় আমাদের কাছে আসে, আমাদের এমএলএ কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার হোম সেক্রেটারি ও ডিজির সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁদের বলা হয় এরকম যদি চলতে থাকে তবে নন্দীগ্রামে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হবে। ওদিকে এই খবর শুনে বারো-চোদ্দ হাজার লোক নন্দীগ্রামে জড়ো হয়ে যায়। আমাদের কাছে খবর আসে যে, মেদিনীপুরের আইজি নন্দীগ্রামে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান। আমরা বলি, একটা শর্তেই আমাদের স্থানীয় নেতারা যেতে পারে, ফল্স্ কেসে কাউকে জড়াতে পারবেন না। আজকের ঘটনাতে মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারতো। আমাদের স্থানীয় নেতারাই জনতার উদ্দেশে বক্তব্য রেখে উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ফলে একথা পরিষ্কার যে, নন্দীগ্রামে যে জনবিস্ফোরণ ঘটছে এর জন্য সিপিএম নেতৃত্ব, রাজ্য সরকার, পুলিশ প্রশাসন ও হলদিয়া

ছয়ের পাতায় দেখুন

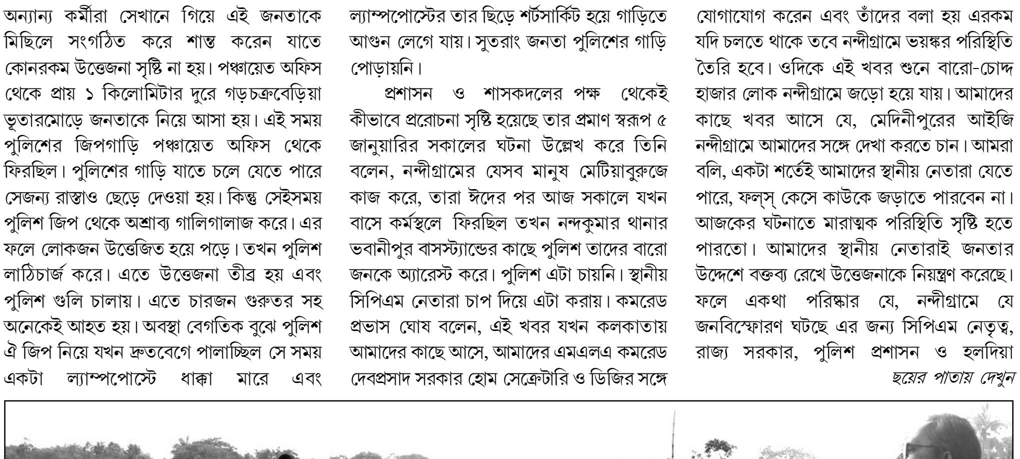

৬ জানুয়ারি নন্দীগ্রামের গড়চক্রবেড়িয়ায় ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখছেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু

বারুইপুরে জমিরক্ষায় গঠিত হ'ল কৃষক ও খেতমজুর সংগ্রাম কমিটি

২৯ ডিসেম্বর বারুইপুর রবীন্দ্রভবনে সহস্রাধিক মানুষের উপস্থিতিতে গঠিত হ'ল 'সারা বাংলা কৃষক ও খেতমজুর সংগ্রাম কমিটি'র বারুইপুর শাখা। বারুইপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সদর স্থানান্তরের নাম করে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার একর জমি কৃষকদের থেকে দখল নিতে চলেছে সরকার। এর সিংহ ভাগ জমি ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে উপনগরী এবং বারাসত থেকে কুকড়াহাটি চার লেনের রাস্তা তৈরির জন্য। এই অধিগ্রহণের ফলে ৩৫টি মৌজার শুধু বহুফসলি জমিই নয়, সাধারণ মানুষের বসতবাড়ি এবং পেয়ারা, আম, লিচু, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী বিশ্বকেতন আচার্য, অ্যাবেকার বারুইপুর শাখার সম্পাদক প্রণব বিশ্বাস, সংগ্রাম কমিটির রাজ্য কমিটির সদস্য জগন্ময় মণ্ডল, সংগ্রামী গণমঞ্চের জেলা আহ্বায়ক সুরজিৎ চক্রবর্তী, চাষী বাঁচাও কমিটির পরাণ সরকার। এছাড়াও বারুইপুরের ৩৫টি মৌজা থেকে আগত আঞ্চলিক কৃষক ও খেতমজুর সংগ্রাম কমিটির বিভিন্ন সদস্য বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন গুরুপদ মণ্ডল। বক্তারা প্রশ্ন তোলেন, যেখানে আলিপুরে কয়েক একর জায়গার উপর দক্ষিণ ২৪ পরগণার সদর দপ্তর থেকে সমস্ত কাজকর্ম

বাতাবিলেবু প্রভৃতি ফলের বিস্তীর্ণ অর্থকরী বাগানগুলিও নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই এলাকার মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ক্ষোভকে সুসংগঠিত প্রতিবাদী আন্দোলনের রূপ দিতেই ২৯ ডিসেম্বর সারা বাংলা কৃষক ও খেতমজুর সংগ্রাম কমিটি থানা কনভেনশনের ডাক দেয়। কনভেনশনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সারা বাংলা কৃষক ও খেতমজুর সংগ্রাম কমিটির রাজ্য সম্পাদক শঙ্কর ঘোষ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ্-এর রাজ্য সম্পাদক সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, এ পি ডি আর-এর রাজ্য সভাপতি সচ্চিদানন্দ মুখার্জী, পরিচালিত হচ্ছে, সেখানে বারুইপুরে সদর দপ্তর করার জন্য ৬০০ একর জমি কেন প্রয়োজন? কেনই বা সরকার ভারতীয়া, কৃষ্ণা গ্লাস ও ফুলতলার অব্যবহৃত জমি ব্যবহার না করে হাজার হাজার কৃষক, খেতমজুর ও বাগিচা মালিককে উৎখাত করে উর্বর জমি অধিগ্রহণে তৎপর।

কনভেনশন থেকে সারা বাংলা কৃষক ও খেতমজুর সংগ্রাম কমিটির বারুইপুর শাখা কমিটি গঠিত হয় এবং জমি রক্ষা আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি গৃহীত হয়। কমিটির সভাপতি হিসাবে গুরুপদ মণ্ডল এবং যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে জগন্ময় মণ্ডল ও হাকিম লস্কর নির্বাচিত হন।

বাঁকুড়ায় নাগরিক কনভেনশন

এস ইউ সি আই জেলা সম্পাদক সহ মিথ্যা মামলায় জেলবন্দী সকল নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবিতে ৩১ ডিসেম্বর বাঁকুড়ায় এক মহতী নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সমরেন্দ্র নাথ পাল। এস ইউ সি আই জেলা অফিসে ২০ ডিসেম্বরের পুলিশি তাণ্ডবের বিরুদ্ধে এবং জেলবন্দী সমস্ত কর্মীদের মুক্তির দাবিতে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবের সমর্থনে অন্যান্যদের সাথে এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রতন মুখার্জী বক্তব্য রাখেন। জেল থেকে প্রেরিত জেলা সম্পাদক জয়দেব পালের বলিষ্ঠ বক্তব্য পাঠ করা হয়। আগামী দিনে যেকোন ধরনের আক্রমণ প্রতিরোধে কনভেনশন থেকে 'গণতান্ত্রিক নাগরিক পরিষদ' গঠিত হয়।

পুরুলিয়ায় কমরেড স্বপন রায়চৌধুরীর স্মরণসভা

এস ইউ সি আই-এর বিশিষ্ট সংগঠক প্রয়াত কমরেড স্বপন রায়চৌধুরীর স্মরণসভা গত ২৪ ডিসেম্বর পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন সাঁওতালডির নেতাজী সামুদায়িক হল উপচে পড়েছিল জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত নবীন প্রবীণ মানুষের উপস্থিতিতে। সভার শুরুতে কমরেড স্বপন রায়চৌধুরীর বিপ্লবী স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বহু মানুষ ও বিভিন্ন গণসংগঠন। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ওপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং পুরুলিয়া জেলা সভাপতি কমরেড ডি কে মুখার্জী সভা পরিচালনা করেন। এছাড়াও দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুনীল মুখার্জীসহ কমরেডস্ ভাস্কর ভদ্র, এস এস ঠাকুর এবং এম কে সিন্‌হা বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা ছিলেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা। তিনি পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন ও পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর বিপ্লবী চরিত্রের নানা শিক্ষণীয় দিক তিনি তুলে ধরেন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

রাঁচিতে আন্দোলনের চাপে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা — বস্তি উচ্ছেদ হবে না

রাঁচিতে ২২টি বস্তি উচ্ছেদ করে প্রায় ২ লাখ লোককে ঘরছাড়া করে উন্নয়নের নামে বিলাসবহুল রেস্তোরাঁ, শপিং মল ও বহুতল তৈরি করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই রাঁচি জেলা সাংগঠনিক কমিটির উদ্যোগে গঠিত 'বস্তি বাঁচাও কমিটি'র নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এই কমিটির নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বস্তিতে অসংখ্য পথসভা, গ্রুপ মিটিং ও গণকমিটি গঠন করে আন্দোলনের খবর গণদাবীতে আগেই প্রকাশিত হয়েছে। গত ৯ ডিসেম্বর বস্তিবাসীদের এক বিশাল মিছিল নগর নিগম মন্ত্রী শ্রীহরিনারায়ণ রায়ের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে। বিধানসভার সামনে ধরনাতেও বসেছেন বস্তিবাসীরা। জান দেব তবু জমি দেব না — এই মনোবলকে ভিত্তি করে দিনে দিনে আন্দোলন তীব্র হয়েছে। শত শত বস্তিবাসী প্রায় প্রতিদিনই মিছিল করেছেন। শেষপর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মধু কোড়া আন্দোলনের চাপে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন যে, জমি অধিগ্রহণ হবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বস্তিবাসীরা নিশ্চিন্ত না হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে আন্দোলনের শপথ নিতে গত ২ জানুয়ারি কলিঙ্গনগরের শহীদদের স্মৃতিতে বস্তি বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে মৌসাবাড়ী, জগন্নাথপুর ও সখুয়া বাগানে শহীদবেদী স্থাপন করে মাল্যদান ও সভা করা হয়। সেখানে শতাধিক মানুষ মাল্যদান করেন। বিকালে জগন্নাথপুর চকে বিশাল সভা হয় যাতে প্রধান বক্তা হিসাবে ছিলেন সম্পাদক কমরেড সিদ্ধেশ্বর সিং।

বিপিটিএ-র রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির (বিপিটিএ) ২০তম দ্বি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন গত ২৪-২৬ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর কাশীশ্বরী গার্লস হাইস্কুলে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দেন।

২৪ ডিসেম্বর এক বিশাল মিছিল বহরমপুর শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে প্রকাশ্য সমাবেশে উপস্থিত হয়। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কবি অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ঘটক, কার্ত্তিক সাহা প্রমুখ। তপন রায়চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। বক্তারা সিঙ্গুর ইস্যুতে রাজ্য সরকারের ভূমিকার কঠোর সমালোচনার পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ব্যর্থতার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

২৫ ডিসেম্বর এক সেমিনারে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকবৃন্দ অংশ নেন। সম্মেলন থেকে, প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল প্রথা, চতুর্থ শ্রেণীতে সরকারি উদ্যোগে বৃত্তি পরীক্ষা এবং অবিলম্বে জানুয়ারি-ডিসেম্বর শিক্ষাবর্ষ চালু করা, শিক্ষায় বিদেশি অর্থগ্রহণ ও সর্বশিক্ষা অভিযানের প্রহসন বন্ধ করা, শিক্ষাদানে বিঘ্ন না ঘটিয়ে উন্নত-মানের মিড-ডে-মিল সরবরাহ করা, জীবনশৈলীর আড়ালে যৌন শিক্ষা চালুর অপচেষ্টা বন্ধ করা, সিঙ্গুর সহ সর্বত্রই কৃষিজমি অধিগ্রহণ বন্ধ করা ইত্যাদি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। পেশাগত বিভিন্ন দাবিতে ১৫ ফেব্রুয়ারি সরকারি-আধা সরকারি কর্মচারীদের সাথে শিক্ষকদেরও গণছুটি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এছাড়া প্রাথমিকে পাশ-ফেল প্রথা ও ৪র্থ শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষা চালু করার দাবিতে ব্যাপক গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ইন্ডিয়ান জুট মিল অ্যাসোসিয়েশন-এর সদর দপ্তরের সামনে ধর্মঘটী চটকল শ্রমিকদের বিক্ষোভ

রাজ্যজুড়ে চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্ডিয়ান জুট মিল অ্যাসোসিয়েশন-এর সদর দপ্তরের সামনে ৫ জানুয়ারি সহস্রাধিক চটকল শ্রমিকদের সমাবেশে বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য রাজ্যের চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘটে ব্যাপক অংশের শ্রমিকদের অংশগ্রহণ উল্লেখ করে তাদের প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং গ্যাঞ্জেস জুট প্রাইভেট লিমিটেড এর মালিকের প্রতি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন যে, শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত ও চুক্তি অনুসারে দাবিসমূহ মেনে না নিলে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য মালিকই দায়ী থাকবেন। তিনি শ্রমিকদের দীর্ঘস্থায়ী লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বানও রাখেন।

ঘাটশিলায় ব্যাঙ্ককর্মীদের শিক্ষাশিবির

গত ২৪-২৫ ডিসেম্বর সারা ভারত ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের উদ্যোগে ব্যাঙ্ক কর্মীদের দু'দিনের শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হল ঘাটশিলাতে। ঘাটশিলায় অবস্থিত মার্কসইজম্-লেনিনইজম্ অ্যান্ড কমরেড শিবদাস ঘোষেস থট স্টাডি সেন্টারে এই শিবির পরিচালনা করেন ইউ টি ইউ সি লেনিন সরণীর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। ২৪ তারিখে সকালে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এই শিবিরের সূচনা হয়। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী ছাড়াও মাল্যদান করেন ফোরামের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায়মণ্ডল, ওড়িশা রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র বেহেরা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি অরূপরতন সাহা, সাধারণ সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস এবং স্টাডি সেন্টারের ইনচার্জ কমরেড মলয় বোস। কমরেড শিবদাস ঘোষের 'শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে' বইটির উপর আলোচনা হয়। ব্যাঙ্কে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ভূমিকা, যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার সমস্যা, পরিবারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যাঙ্ক কর্মচারীসহ সামগ্রিক শ্রমিক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ প্রভৃতি প্রসঙ্গে উত্থাপিত প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত প্রতিনিধিরা। কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী এই প্রশ্নগুলিকে ঘিরে সামগ্রিকভাবে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন, মার্কসবাদের যথাযথ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি এবং তাতে আমাদের ভূমিকার দিকটিকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে। তিনি শ্রমিক আন্দোলনে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক শক্তির শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সজাগ থাকতে বলেন। সমাজপ্রগতির আন্দোলনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা তাদের পরিবারের সমস্ত সদস্যকে যাতে যুক্ত করার প্রয়াস চালান সে বিষয়টির প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এই শিবির ২৫ ডিসেম্বর দুপুর পর্যন্ত চলে। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাশিবিরের কাজ সমাপ্ত হয়।

এসইজেডঃ দেশি-বিদেশি পুঁজির নির্মম শোষণ-লুণ্ঠনের বিশেষ ব্যবস্থা

জমি গ্রাস করে উন্নয়নের(!) যে পরিকল্পনা রচিত হয়েছে তার অন্যতম প্রধান বিষয় হ'ল বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zone) বা 'এসইজেড' (SEZ) গঠন। দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস-বিজেপি এবং সরকারি গদিতে আসীন বামেরা একবাক্যে বলছেন — এসইজেডের হাত ধরেই দেশের বুকে উন্নয়নের জোয়ার আসবে, শিল্পবিকাশের হার বাড়বে, জিডিপি বৃদ্ধির হার সর্বকালীন রেকর্ড সৃষ্টি করবে, রপ্তানি বাণিজ্য ফুলে ফেঁপে উঠবে, বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার ভরে যাবে, সাথে সাথে কর্মসংস্থানের দুয়ারও খুলবে। এসইজেড গঠনের জন্য তাই সব ধরনের প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে। এ সম্পর্কিত আইনকানুনও করা হয়েছে। 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন ২০০৫'-এর শুরুতেই বলা হয়েছে — "রপ্তানির বৃদ্ধি ঘটাবার জন্যই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হচ্ছে।" এসইজেড আইনে রপ্তানি বলতে এ দেশের পণ্য বিদেশে পাঠানোকেই শুধু বোঝায় না, এসইজেডভুক্ত এলাকায় এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে বা এসইজেড এলাকা থেকে দেশের সাধারণ শুল্ক এলাকায় পণ্য চলাচলকেও রপ্তানি বলে গণ্য করা হবে। তাই, যদি কখনও এমন অবস্থা দেখা দেয় যে, বিদেশে পণ্য রপ্তানি কমে গেল, তাহলেও এই আইনের রপ্তানির সংজ্ঞা অনুযায়ী রপ্তানি কয়েকগুণ বেড়েছে — একথা সহজেই দেখানো যাবে।

দু'হাজার সালের শুরুতে ভারতে বাণিজ্য নীতির অঙ্গ হিসাবে এসইজেড পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল — বাণিজ্য কর ও শুল্ক ক্ষেত্রে এসইজেড অঞ্চলকে বিদেশি ভূখণ্ড হিসাবে গণ্য করা হবে। এসইজেড গঠনের আগে এদেশে এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন বা ইপিজেড তৈরি করা হয়েছিল। প্রথম ইপিজেড এদেশে তৈরি হয় গুজরাটের কান্দলায়, ১৯৬৫ সালে। ২০০০ সালের আমদানি-রপ্তানি নীতিতে যখন এসইজেড গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়, তখন এই ধরনের ৮টি ইপিজেডকে এসইজেড-এ রূপান্তরিত করা হয়েছিল। কিন্তু তখনও এসইজেড সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বিধি বা নিয়ম তৈরি হয়নি। কী ধরনের কর ছাড় দেওয়া হবে, বা অন্যান্য কী কী ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হবে, সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা রচিত না হওয়ায় এসইজেড সম্পর্কে শিল্পমহলের উৎসাহ ছিল সীমাবদ্ধ। ১৯৯৬ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত শিল্পক্ষেত্রে যে বিনিয়োগ হচ্ছিল, তার সিংহভাগই যাচ্ছিল পরিষেবা ক্ষেত্রে, তাই এসইজেড-এর দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হয়নি। পরিষেবা ক্ষেত্রের মধ্যে আবার সিংহভাগ বিনিয়োগ ঘটছিল সফ্টওয়ার ক্ষেত্রে। কারণ এই ক্ষেত্রে কর ছাড় ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধার বন্দোবস্ত ছিল। ফলে এক্ষেত্রে কিছু কিছু এসইজেড গড়ে ওঠে। বর্তমানে পুরোদস্তুর কাজ করছে দেশে এ রকম এসইজেডের সংখ্যা মাত্র ১৫টি, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই ৫টি। এই সমস্ত এসইজেডগুলির গড় আয়তন ২০০ একর। ২০০৩-০৪ সাল জুড়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে এসইজেডগুলিকে ধুলোয় ঢাকা ফাঁকা মাঠ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রাজধানী দিল্লির অদূরে নিরেলায় এসইজেড হিসাবে চিহ্নিত খালি জমিকে আর একটি ব্যর্থ নীতিগত উদ্যোগের প্রতীক হিসাবে অনেকে দেখেছিলেন।

তারপর থেকে পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে যেতে থাকে। এসইজেড সম্পর্কিত আইন তৈরির পর দেখা যায় — কৃষিজাত পণ্য, প্রক্রিয়াজাত খাবার, যে কোনও প্রক্রিয়াজাত জিনিষ, কফি-চা-চিনি-পাট, নুন, মশলা, সামুদ্রিক পণ্য, ঔষধপত্র, কয়লা, তেল শিল্প, তামাক ইত্যাদি এই ধরনের আরও বহু পণ্য থাকবে সম্পূর্ণ করমুক্ত অবস্থায়। দেশের সাধারণ শুল্ক এলাকা (National Tariff Area) থেকে এই এসইজেড অঞ্চলে পণ্য বা পরিষেবা আমদানি বা এখান থেকে রপ্তানি হলে কোন 'কর-সেস-শুল্ক' লাগবে না। শিল্পপতিরা যাকে কমপ্লিট ট্যাক্স হলিডে বলে থাকেন, এ যেন একেবারে ঠিক তাই। এ ছাড়াও মালিকদের জন্য এক্ষেত্রে অন্যান্য আরও বহুবিধ বেনজির সুবিধার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই দেশ-বিদেশের পুঁজিপতিমহল এতে খুব খুশি। এই পরিকল্পনার মধ্যে তারা বিপুল মুনাফার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে। গত এক বছরেই ২৭৫টি এসইজেড প্রকল্পের সরকারি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং আরও অসংখ্য আবেদন অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এসইজেড প্রকল্পগুলিতে পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণও বিশাল। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ মহারাষ্ট্রে দু'টি এসইজেড প্রকল্পের জন্য বিনিয়োগ করছে ৩০ হাজার কোটি টাকা। হরিয়ানাতে আর একটির জন্য ওরা বিনিয়োগ করছে ৪০ হাজার কোটি টাকা। ডিএলএফ গোষ্ঠী অমৃতসর, আম্বালা, লুধিয়ানা ও গুরগাঁওতে তাদের চারটি প্রকল্পের জন্য ৩১ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। ডি এস গ্রুপ হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশে দু'টি এসইজেড প্রকল্পের জন্য বিনিয়োগ করছে ১২ হাজার কোটি টাকা। পরিকাঠামো উন্নয়নের পরামর্শদাতা সংস্থা 'ফিডব্যাক ভেনচার' একটা হিসাবে বলেছে — এইক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫,৫০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে পারে। হিসাবটা সার্বিক বলে ধরে নিলে, বিনিয়োগের এই অঙ্ক দেশের জিডিপি'র ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। বিনিয়োগের পরিমাণ দিয়ে যারা উন্নয়নের হিসাব কষে থাকেন — এতে তারা খুবই উল্লসিত। কী ধরনের মুনাফা আশা করছে ওরা? রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ মুম্বাইতে যে নভি মুম্বাই এসইজেড প্রকল্প চালু করছে তার থেকে বিনিয়োগকৃত অর্থের ১২ শতাংশ মুনাফা হবে বলে ওদের হিসাব। অনেক সংস্থা এর থেকেও বেশি মুনাফা আশা করছে। ফলে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা টাকার থলি নিয়ে মুনাফা শিকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

এসইজেড প্রতিষ্ঠার এই বিপুল আয়োজনে জমির দরকার হবে প্রচুর। ইতিমধ্যেই যাদের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে তাদের জন্যই জমি লাগবে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার একর। এই পরিমাণ যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা বলা এক কথায় অসম্ভব। আর এই জমি গ্রাস করতে গিয়ে উচ্ছেদের যে বীভৎস আয়োজন করতে হবে, তা মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। সেখানে এসইজেড প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য সালিম গোষ্ঠীকে দেওয়া হচ্ছে ৩৮টি মৌজার ১৪,৫০০ একর জমি। আর তা দিতে গিয়ে সরকারি হিসাবে উচ্ছেদ করতে হবে ১৫ হাজার পরিবার, ১২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩টি মাদ্রাসা, ১১২টি মন্দির, ৪২টি মসজিদ — এছাড়াও বহু শ্মশান ও কবরস্থান, দোকানপাট, ঘরবাড়ি। (তথ্যসূত্র ঃ আজকাল, ১০-১২-০৬) অন্য সব প্রকল্পকে একসাথে ধরলে শুধু এস ই জেড প্রকল্পের জন্য এ রাজ্যে জমি দখল করা হবে এ পর্যন্ত ঘোষণা অনুযায়ী ৩৫ হাজার একরের কাছাকাছি। প্রতিদিনই এর পরিমাণ বাড়ছে। এর মধ্যে উর্বর কৃষিজমি রয়েছে বিপুল পরিমাণ। দেশের সর্বত্র একই অবস্থা।

এসইজেডের আন্তর্জাতিক চেহারা

এসইজেডের ধারণা রূপ লাভ করে চীনে। সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে পুঁজিবাদী অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ সাধনের প্রয়োজন থেকেই সেখানকার রাষ্ট্রনায়করা এই এসইজেড গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম এসইজেডগুলি তৈরি করা হয়েছিল গুয়ানডং প্রদেশের শেনজেন, জুহাই এবং সাটাওতে। এছাড়াও ফুজিয়ান প্রদেশের জিয়াসেন ও হাইনান প্রদেশে এসইজেড গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব এসইজেড অঞ্চল সমুদ্র উপকূলবর্তী, কারণ তাতে পণ্য রপ্তানির অবস্থানগত সুবিধা পাওয়া যায়।

চীনের এইসব এসইজেড বিশেষ কর ছাড় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানা সুবিধা ভোগ করে। এই অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তথাকথিত চার নীতির (Four Principles) মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এই চার নীতি হল —

* বিদেশি মূলধন আকৃষ্ট ও ব্যবহার করা,
* এই অঞ্চলে অবস্থিত শিল্পোদ্যোগ হবে, হয় সম্পূর্ণ বিদেশি উদ্যোগ, আর না হয় চীনা কোম্পানির সাথে বিদেশি কোম্পানির যৌথ উদ্যোগ,
* পণ্য উৎপাদন করা হবে রপ্তানি বাজারের দিকে লক্ষ রেখে,
* এইসব অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাজকর্ম হবে সম্পূর্ণভাবে বাজার চালিত। এর প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত।

এই এসইজেড অঞ্চলে যে সব পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলি গড়ে উঠেছে, সেগুলি সস্তা ও সহজলভ্য জমি ও শ্রমের ব্যবহার করে স্বল্প ব্যয়ে চীনের ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। স্বল্পমূল্যের এই পণ্য বিশ্বে রপ্তানি করে চীনের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। কিন্তু এসইজেডের এই সাফল্য সেখানকার জনজীবনে আশীর্বাদ নিয়ে আসেনি। বরং দেখা যাচ্ছে, সেখানে পুঁজিবাদ যত শক্তিশালী হচ্ছে তত ধনী-গরিব বৈষম্য বাড়ছে, বাড়ছে বেকারি, কর্মচ্যুতি, দারিদ্র্য, অনাহার। দেখা যাচ্ছে — "উপকূল এলাকার রপ্তানি অঞ্চলগুলিতে মাত্র তিন চার বছর আগেও অবস্থা যা ছিল, তার বিপরীতে এখন ক্রমশ শ্রমিকের অভাব দেখা যাচ্ছে। গ্রাম থেকে আগত শ্রমিকেরা দলে দলে তাদের গ্রামে বা অন্তত নিজেদের অঞ্চলের শহরগুলিতে ফিরে যাচ্ছে .... উপকূল এলাকার কারখানাগুলিতে যে ভয়ানক শোষণ চলে তা অসহ্য হওয়ার জন্য। এমনকী গ্রাম থেকে আসা নতুন যুবক ও বিশেষত দরিদ্র কৃষক রমণীরা, যাদের মালিকরা বেশি পছন্দ করে এবং সবচেয়ে বেশি শোষণের শিকার যাদের হতে হয়েছে, তাদের সংখ্যাও কমে আসছে।" *(চীনে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা, রবার্ট ওয়েইল, মান্থলি রিভিউ)*

শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা যতই খারাপ হোক, পুঁজিবাদী অর্থে চীনের এই সাফল্য বিশ্বের অনেক পুঁজিবাদী দেশকে এসইজেড গঠনে আগ্রহী করে তুলেছে। নির্দিষ্ট অঞ্চলে পুঁজির মালিকদের বিপুল ভরতুকি দিয়ে রপ্তানি বাড়িয়ে প্রচুর অর্থ কামানো যাবে বলে মনে করছে তারা।

এসইজেডের ভারতীয় মডেল

বিশ্বের নানা জায়গায় যেসমস্ত এসইজেড গড়ে উঠেছে তার একটা বৈশিষ্ট্য হল, এগুলো গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে, রাষ্ট্রীয় মালিকানায়। নানা সুযোগসুবিধা দিয়ে রাষ্ট্র এখানে দেশি-বিদেশি পুঁজিকে আবাহন করছে ব্যবসা করার জন্য। কিন্তু ভারতে বিষয়টা ভিন্ন ধরনের। এখানে এসইজেড গড়ে তুলছে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট সংস্থা এবং রাষ্ট্র ও সরকার নানাভাবে তাকে সাহায্য করছে। তাই এখানে এসইজেড গড়ে তোলাটাই একটা বড় ব্যবসা। এই এসইজেডগুলির মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প কতটা গড়ে উঠবে, রপ্তানি কতটা বৃদ্ধি পাবে বা বিদেশি মুদ্রা কী পরিমাণে অর্জিত হবে তা ভবিষ্যতের বিষয়। কিন্তু শুধু এসইজেড গড়ে তুলেই দেশি-বিদেশি পুঁজির মালিকরা হাজার হাজার কোটি টাকা পকেটে পোরার স্বপ্ন দেখছে, একথা পরিষ্কার।

এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা এসইজেড কী? এসইজেড হল একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল, যেখানে ব্যবসার নিয়মকানুন দেশের অন্যান্য অংশের থেকে একেবারে আলাদা হবে। বিশ্বায়নের তথাকথিত উন্নয়নের মডেল যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের কথা হ'ল — দেশে পুঁজির আগমন-নির্গমনের ক্ষেত্রে যেসমস্ত বাধানিষেধ আছে, এর ফলে তা দূর হয়ে যাবে। পুঁজির যথেচ্ছ বিচরণ এখানে অবাধ হবে।

এসইজেড গড়ে তোলার জন্য প্রথমেই চাই বিপুল পরিমাণ জমি। যত বেশি জমি হয় ততই ভাল। জমি বিচ্ছিন্ন হলে চলবে না, পরস্পর সংলগ্ন হওয়া চাই। আরও ভাল হয় যদি কোন বিশাল নগরীর আশপাশের জমি পাওয়া যায়। তাতে অনেক সুবিধা। কিন্তু কৃষিজমির মালিক কৃষকরা জমির উপর তাদের অধিকার ছেড়ে দিতে একেবারেই ইচ্ছুক নন। এক্ষেত্রে বাজার অর্থনীতির প্রবক্তারা কিন্তু বাজারের উপর একেবারেই ভরসা করছে না। তারা চাষীদের কাছে গিয়ে সরাসরি দরদাম করে জমি কেনার চেষ্টা করছে না। কারণ দুটো। এক, প্রচলিত আইনে তাতে অসুবিধা আছে। জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন মেনে এই বিপুল পরিমাণ জমি পাওয়া যাবে না, এজন্য এই আইন পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। দুই, চাষীরা সবাই জমি বিক্রি করতে রাজিও হবে না। তাই বেসরকারীকরণের প্রবক্তারা সরকারকে বলছে — 'জমির ব্যবস্থা করে দাও, প্রয়োজনে কৃষক উচ্ছেদ করো, বর্গাদার তাড়াও, খেতমজুরকে ভিখারিতে পরিণত কর।' পুঁজির সেবাদাস রাষ্ট্র ও সরকারগুলো ভারত জুড়ে সেই কাজ শুরু করেছে। মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস সরকার, উত্তরপ্রদেশের মুলায়ম সিং সরকার, রাজস্থানের বিজেপি সরকার, বা পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম ফ্রন্ট সরকার — এক্ষেত্রে সবার চেহারা চরিত্র একই। পুঁজির সেবায় সবাই নিবেদিত প্রাণ। পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম সরকার তো জোর করে কৃষিজমি দখল করতে পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের তৈরি ১৮৯৪ সালের আইনের আশ্রয় নিয়েছে !

এদের জমি দখলের প্রক্রিয়া কী? মোটামুটি পদ্ধতিটা এইরকম। বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্য সরকার নানা ধরনের উন্নয়ন নিগম তৈরি (Development Corporation) করেছে। এই সব উন্নয়ন নিগম প্রথমে জমি অধিগ্রহণ করছে এবং পরে তা তুলে দিচ্ছে পুঁজিপতিদের হাতে। যেমন, অন্ধ্রপ্রদেশে 'অন্ধ্রপ্রদেশ শিল্প পরিকাঠামো কর্পোরেশন' পাঁচ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করেছে এবং তারপর তা তুলে দিয়েছে 'সত্যভেদু রিজার্ভ ইনফ্রা সিটি'র হাতে। মহারাষ্ট্রে 'মহারাষ্ট্র শিল্প উন্নয়ন নিগম' (MIDC) প্রায় ২২ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করেছে এবং তা তুলে দিয়েছে ভিডিওকন, ভারত ফোর্জ, মাহিন্দ্র অ্যান্ড মাহিন্দ্র ও রিলায়েন্সের হাতে। পশ্চিমবঙ্গে শিল্প উন্নয়ন নিগম ছাড়াও গড়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। যেমন হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, খড়গপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, শিলিগুড়ি - জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ইত্যাদি। এই সমস্ত ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করছে এবং তা দিয়ে দিচ্ছে পুঁজির মালিকদের। সালিম গোষ্ঠীকে এসইজেড গঠন

চারের পাতায় দেখুন

এসইজেড ঃ রাষ্ট্রের মধ্যে পৃথক রাষ্ট্র

তিনের পাতার পর

করার জন্য যে ১৪,৫০০ একর জমি নন্দীগ্রামে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে তাও অধিগ্রহণ করানো হবে এই ধরনের কোন ডেভেলপমেন্ট অথরিটিকে দিয়ে। এই ধরনের আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। যাই হোক, যে জমি নিয়ে প্রথমে এসইজেড গঠন করা হবে, প্রয়োজনে ভবিষ্যতে তার সাথে আরও জমি যুক্ত করে এসইজেড অঞ্চলকে বাড়ানো যেতে পারে। আইনে সেই ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

ডেভেলপাররা বিপুল মুনাফা লুটবে

একটা বিশ্বমানের এসইজেড গঠন করতে কী কী জিনিস প্রয়োজন? তার খরচ কত? বলা হচ্ছে, কমপক্ষে জমি দরকার ১২ হাজার একর। সেই জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নের জন্য দরকার ৯,৩২৫ কোটি টাকা। দু'হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রয়োজন — এর খরচ ৮,০০০ কোটি টাকা। একটা ছোট বিমানবন্দরের জন্য প্রয়োজন ২০০ কোটি টাকা। একটা নৌবন্দরের জন্য ৫০০ কোটি টাকা। জলপ্রকল্পের জন্য ৮০০ কোটি টাকা। মোট ১৮,৮২৫ কোটি টাকা। (সূত্র ঃ Business world estimates on reports from industry sources)

কৃষক-খেতমজুর-বর্গাদার বা সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষদের উৎখাত করে সরকার জমি যাদের হাতে তুলে দিল, এসইজেড আইনে তাদের বলা হচ্ছে 'ডেভেলপার' (developer)। এই ডেভেলপার আবার নানা প্রতিষ্ঠান, শিল্প সংস্থা বা সরকারের সাহায্য নিতে পারে এই এসইজেড গড়ে তোলার জন্য। এদের এসইজেড আইনে বলা হচ্ছে 'কো-ডেভেলপার' (co-developer)। নন্দীগ্রামে জমি যদি সালেম গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হয় তবে এক্ষেত্রে 'সালেম গোষ্ঠী' ডেভেলপার এবং যাদের সাহায্য সালেম গোষ্ঠী নেবে তাদের কো-ডেভেলপার বলা হবে। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই যেসব সংস্থা এসইজেডের জন্য হাত বাড়িয়েছে, তারা হল 'ভিডিওকন রিয়ালটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার', 'নিউ কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এবং 'সালারপুরিয়া প্রপার্টিজ'। জমি পাওয়ার পর ডেভেলপার সেই এলাকাকে তার পরিকল্পনা মত পুনর্গঠন করবে। কোথায় শিল্প ইউনিটের জন্য জায়গা রাখা হবে, কতটা রাস্তাঘাট হবে, আবাসন প্রকল্প কতটা কোথায় হবে, বিদ্যুৎ প্রকল্প - জল প্রকল্প কোথায় কী ধরনের হবে, স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল-শপিং মল ও নানা ধরনের বিনোদন কেন্দ্র কোথায় হবে তার সুবিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করে এলাকাটিকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর বন্দোবস্ত করবে ঐ ডেভেলপার। এই কাজে সে নানা ধরনের কো-ডেভেলপারের সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারে। পুনর্গঠনের এই প্রক্রিয়ায় প্রথম দিকে পুঁজির প্রয়োজন। ডেভেলপাররা এই পুঁজির যোগানদার। 'কো-ডেভেলপাররাও' পুঁজির যোগান দিয়ে সহায়তা করে থাকে। একদিকে ডেভেলপাররা এসইজেড এলাকা পুনর্গঠন করতে থাকে, অন্যদিকে চলে ক্রেতা সন্ধানের কাজ। যত ক্রেতা আসবে, যত এসইজেড এলাকা জমজমাট হবে, তত জমির দাম বাড়তে থাকবে। আর একবার এসইজেড প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ডেভেলপারদের হাতে যত বেশি জমি থাকবে, তত তার মুনাফার থলি পূর্ণ হবে। তখন খরচের ৪০-৫০ গুণ দামে জমি বিক্রি করা যাবে। এইজন্য এসইজেড প্রতিষ্ঠার শুরুতেই ডেভেলপাররা প্রচুর জমির উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, এসইজেড এলাকার আয়তন বাড়িয়ে নিতে চায়।

কিন্তু ডেভেলপারদের মুনাফা শুধু এখান থেকে আসবে ভাবলে ভুল হবে। ডেভেলপারদের কাজ মূলত দু'ধরনের। তাদের প্রথম কাজ রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের মত। জমি নাও, পুনর্গঠন কর, খদ্দের দেখে বিক্রি কর এবং লাভ কর। দ্বিতীয় কাজ অনেকটা মিউনিসিপ্যালিটির মত। মিউনিসিপ্যালিটি যেমন পরিষেবা দেওয়ার জন্য নানা ধরনের কর বসিয়ে থাকে, তেমনি এসইজেড এলাকার ডেভেলপাররাও নিজ নিজ এসইজেডে নানা ধরনের সার্ভিস চার্জ বসাতে পারবে। এসইজেড আইনে ডেভেলপারদের এই অধিকার দেওয়া হয়েছে। ফলে এসইজেড এলাকায় একটা সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে তুলতে পারলে ডেভেলপারদের পোয়াবারো। তারা ইচ্ছামতো সার্ভিস চার্জ (অর্থাৎ বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার রাখা, রাস্তাঘাট জঞ্জালমুক্ত রাখা ইত্যাদি) বসাবে এবং মুনাফার থলি পূর্ণ করবে। এমনকী প্রয়োজনমত এরা জমি কম দামেও দিতে পারে এবং পরে সার্ভিস চার্জ বাবদ আয় বাড়িয়ে সেই ক্ষতি পূরণ করতে পারে। রিলায়েন্স আশা করছে, মুম্বাইতে এ'রকম একটা এসইজেডে কমপক্ষে ১০ লক্ষ মানুষ বাস করবে। ফলে সেই এসইজেড অঞ্চল থেকে সার্ভিস চার্জ বাবদ আয় কী বিপুল দাঁড়াবে তা সহজেই বোঝা যায়।

রাষ্ট্রের মধ্যে আলাদা রাষ্ট্র

কিন্তু এই এসইজেডগুলির প্রশাসনিক কাজকর্ম চলবে কী ভাবে? আইনে (SEZ Act, 2005) এ প্রসঙ্গে কী বলা হয়েছে? এসইজেড পরিচালনা করবে 'এসইজেড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি'। তাতে থাকবে ডেভেলপারের দু'জন প্রতিনিধি এবং রাজ্য সরকার নিয়োজিত একজন ডেভেলপমেন্ট কমিশনার, এছাড়াও থাকবে আরও তিনজন। অর্থাৎ মোট ছয়জনের কমিটি। কিন্তু এক-তৃতীয়াংশেই কোরাম হবে। দু-জন উপস্থিত হয়ে যেকোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। লক্ষ্যণীয়, ডেভেলপারের মনোনীত প্রতিনিধি কিন্তু দু-জন। এরাই সর্বশক্তিমান। এসইজেড এলাকা পরিচালনায় এরাই সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে, এসইজেডের অধিবাসীদের কোন প্রতিনিধি সেখানে থাকবে না, বা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণও এখানে থাকবে না।

এর অর্থ হ'ল, মিউনিসিপ্যালিটি বা রাজ্য সরকার যে কাজ করে থাকে এখানে সেই কাজ করবে এসইজেড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। এইসব কাজের জন্য এরা ইচ্ছামতো সার্ভিস চার্জ বসাবে এবং তা না দিতে পারলে এদের কাছ থেকে পরিষেবা পাওয়া যাবে না। সার্ভিস চার্জ নিয়ে যদি এরা পরিষেবা না দেয় তাহলে ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কর্তাব্যক্তিদের শাস্তির কিন্তু কোন বিধান আইনে নেই।

এসইজেড এলাকায় যে বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে, তার উপর রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। বিদ্যুৎ উৎপাদক কোম্পানি তার প্রয়োজন মত দাম নির্ধারণ করবে এবং কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার তার উপর কোন কর ধার্য করতে পারবে না।

রাজ্যের পুলিশ এসইজেড এলাকায় ঢুকতে পারবে, যদি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি তার সাহায্য প্রার্থনা করে। না হলে, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্ব এসইজেড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির। এসইজেড এলাকায় সংগঠিত কোন অপরাধ বা বিবাদ মীমাংসা করবে এসইজেড আইনে নিযুক্ত বিশেষ আদালত। এই আইনে বিচারে কেউ সন্তুষ্ট না হলে সে হাইকোর্টে আবেদন করতে পারবে।

সবচেয়ে বড় কথা হ'ল — এসইজেড আইনের ৪৯ ধারায় বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার মনে করলে বিশেষ একটি এসইজেড, একগুচ্ছ এসইজেড বা সমস্ত এসইজেডকে কেন্দ্রীয় কোন আইন বা বিধিনিয়ম থেকে মুক্ত করে দিতে পারে। অর্থাৎ সেই আইন বা বিধিনিয়ম ঐ এসইজেড বা এসইজেডগুলির উপর আর কার্যকর থাকবে না। অনেকেই এসইজেড আইনে ডেভেলপারদের এই বিশেষ আইনি ক্ষমতাকে দেশের মধ্যে আলাদা 'সার্বভৌম' ক্ষমতা বলে বর্ণনা করেছেন।

পুঁজি এসইজেডে আগ্রহী কেন

এসইজেড প্রতিষ্ঠার জন্য জমি পাওয়ার পর কোন দেশি বা বিদেশি কর্পোরেট সংস্থা যদি ব্যবসা জমাতে না পারে তাহলে কী হবে? সেই সমস্ত জমি বা এলাকার কী হবে? সেই জমি নিয়ে কী করবে সেই কর্পোরেট সংস্থা? এ সম্পর্কে কিন্তু এসইজেড আইনে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা নেই।

ডেভেলপারদের বিশেষ আইনী সুবিধার কথা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু তাদের কথায় এখানে ইউনিট খুলতে বিভিন্ন শিল্প বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসবে কেন? এগিয়ে আসবে, কারণ তাদের জন্যও নানা ধরনের সুবিধার ঢালাও আয়োজন করা হয়েছে। সুবিধাগুলি এইরকম —

এক, এই সমস্ত এসইজেড এলাকাগুলিতে বাস্তবে শ্রমিকদের কোন অধিকার থাকবে না। শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত যে সমস্ত আইন দেশে রয়েছে তার কোনটাই এই এলাকায় কার্যকর নয়। শ্রম সংক্রান্ত ১০(২) ধারা এই অঞ্চলে অচল। যার মানে হল, এসইজেড এলাকায় অবস্থিত যে কোন ইউনিটের মালিক তার শ্রমিককে সারা জীবনের জন্য চুক্তি-শ্রমিকে পরিণত করে রাখতে পারে সামাজিক সুরক্ষার যে বিধিনিয়ম আছে তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে।

দুই, কোনও কোনও রাজ্যে (যেমন কংগ্রেস শাসিত মহারাষ্ট্রে) এসইজেডগুলিকে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা (public utility service) হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। এর অর্থ হল, এই সমস্ত অঞ্চলে শ্রমিকদের সংগঠিত দর-কষাকষির আর কোন সুযোগ থাকবে না। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের রাস্তায় তাদের পা দেওয়া চলবে না। মালিকরা ইচ্ছামতো নিয়োগ করবে, ইচ্ছামতো ছাঁটাই করবে, ইচ্ছামতো মাইনে দেবে — কোন ক্ষেত্রেই প্রতিবাদ করা চলবে না।

তিন, এসইজেড অঞ্চলগুলিকে যে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, পরিবেশগত বিধিনিষেধ থেকে তাকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়া। অবশ্য কোনও রাজ্য 'নাম কা ওয়াস্তে' একটা বিধিনিষেধ রেখেছে। তা হ'ল, এই এলাকায় স্থাপিত শিল্প-কারখানার পরিবেশগত বিরূপ প্রভাবের মূল্যায়ন করবে এসইজেড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, অর্থাৎ বাস্তবে ডেভেলপারের নিয়োজিত কর্মকর্তারা। কী মূল্যায়ন হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই আইনের সুযোগ নিয়ে পরিবেশগত আইনের কড়াকড়ির ফলে যেসমস্ত ইউনিট শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে খোলা যায় না — তা ভারতে এসে ভিড় করতে পারে। তার ফলে এ দেশের জলবায়ু ও পরিমণ্ডলের বিপুল ক্ষতিসাধন করতে পারে। এসইজেড এলাকা না হলেও বাঁকুড়ায় প্রতিষ্ঠিত স্পঞ্জ আয়রন কারখানাগুলির পরিবেশ দূষণের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়।

চার, কর ছাড়ের সর্বব্যাপক আয়োজন। কী বিপুল পরিমাণ কর ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার উল্লেখ শুরুতেই খানিকটা করা হয়েছে।

পাঁচ, এসইজেড আইনে রপ্তানির এতদিনকার সংজ্ঞা পাল্টে দেওয়া হয়েছে। এদেশে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে পাঠানোকেই এতদিন রপ্তানি বলে মনে করা হত। রপ্তানি বৃদ্ধি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নানারকম ভর্তুকির (এক্সপোর্ট সাবসিডি) ব্যবস্থা করে। এখন এসইজেড আইনে রপ্তানির অর্থ হ'ল — (ক) দেশের পণ্য বিদেশে পাঠানো, (খ) এসইজেড এলাকাভুক্ত এক ইউনিট থেকে অন্য ইউনিটে পাঠানো, (গ) এসইজেড এলাকা থেকে সাধারণ শুল্ক এলাকায় পণ্য বা পরিষেবা পাঠানো ইত্যাদি। এর অর্থ হচ্ছে, পণ্য বিদেশে না পাঠিয়েও এসইজেড এলাকাভুক্ত যে কোন ইউনিট সরকারের কাছে রপ্তানি ভর্তুকি দাবি করতে পারে এবং জনগণের ট্যাক্সের টাকা এইভাবে ওদের পকেটে গুঁজে দিতে রাষ্ট্রকে বাধ্য করতে পারে। এরকম আরও বহুবিধ সুবিধার বন্দোবস্ত দেশিবিদেশি পুঁজিপতিদের জন্য এসইজেড আইনে করা হয়েছে। তাই তারাও এসইজেড প্রতিষ্ঠায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

নন্দীগ্রামে এই এসইজেডের জন্যই কৃষিজমি দখলে মরিয়া সিপিএম ৬ জানুয়ারি গভীর রাতে জমি দিতে অনিচ্ছুক ৬ জন কৃষককে হত্যা করেছে।

শিল্পের নামে উপনগরী

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের অবস্থা কী? প্রায় সমস্ত তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প এসইজেড গঠনে অতি উৎসাহী কেন? কারণ, বর্তমান আয়কর আইনের আওতায় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প যে কর ছাড় পায়, তা ২০১০ সালের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এসইজেড গঠন করা যায় তাহলে কর ছাড়ের সুবিধা আরও অন্তত ৩০ বছর পাওয়া যাবে। এই কারণে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে এত এসইজেড গঠনের ঘটা।

আর একটা বিষয়ও লক্ষ করার মত। এসইজেড গঠনে যারা আগ্রহ দেখাচ্ছে বেশি, তাদের একটা বড় অংশ রিয়েল এস্টেট বা আবাসন নির্মাণ ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত। আইনে বলা হচ্ছে, এসইজেড অঞ্চলের ২৫ শতাংশ জমি রিয়েল এস্টেট ব্যবসার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে (কোন কোন রাজ্যে এর পরিমাণ ৫০ শতাংশ, যেমন কংগ্রেস শাসিত মহারাষ্ট্র বা বিজেপি শাসিত রাজস্থান) তাই আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, প্রমোটাররা শেষপর্যন্ত এই অঞ্চলগুলিকে পরিকল্পিত উপনগরী হিসাবে গড়ে তুলবে। বেশিরভাগ রাজ্যেই জমির ঊর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত আইন থাকার ফলে প্রোমোটাররা এই পরিমাণ বিপুল জমি পেতেন না, এসইজেড চালু হলে যা পাওয়া তাদের কাছে শুধু সময়ের অপেক্ষা। ফলে রপ্তানি বৃদ্ধির কথা বলে এসইজেড গঠনের পরিকল্পনা হলেও বাস্তবে এসব রিয়েল এস্টেট ব্যবসার আখড়া হয়ে উঠবে।

আর একটা প্রশ্নও এসইজেডগুলিকে কেন্দ্র করে উঠতে শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠেছে — যদি রপ্তানি বৃদ্ধির জন্যই এসইজেড প্রকল্প রচিত হয়ে থাকে, তবে সেগুলি তো মূলত সমুদ্রবন্দরের কাছাকাছি হওয়ার কথা। কারণ, তাতে রপ্তানির জন্য অবস্থানগত সুবিধা পাওয়া যাবে। কিন্তু ভারতে সব থেকে বেশি এসইজেড গড়ে তোলা হচ্ছে পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় — যা বন্দর থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত। তাহলে রপ্তানি বৃদ্ধিই কি মূল উদ্দেশ্য?

আর একটা গুরুতর প্রশ্নও উঠছে। তাহল, ব্যাপক এই কর ছাড় জাতীয় অর্থনীতিতে কী প্রতিক্রিয়া ফেলবে। এসইজেড স্থাপনের এই বিপুল উদ্যোগের ফলে করবাবদ রাজস্ব আদায় কতটা কমতে পারে তা খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক ন্যাশানাল ইন্সটিটিউট ফর পাবলিক ফিনান্স এন্ড পলিসিকে (NIPEP) সমীক্ষার দায়িত্ব দেয়। এই সমীক্ষার প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ এক লক্ষ কোটি টাকা দাঁড়াতে পারে। ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরে কেন্দ্রের অনুমিত কর বাবদ রাজস্ব ৪ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা। তাই এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এসইজেড-এর জন্য প্রায় ২০ শতাংশ রাজস্ব হ্রাস পেতে পারে। দেশি-বিদেশি পুঁজিকে এই বিপুল পরিমাণ সুবিধা দিতে গিয়ে রাজস্বের এই ঘাটতি শেষ পর্যন্ত উশুল করা হবে

ছয়ের পাতায় দেখুন

মহান নভেম্বর বিপ্লবের হাতিয়ার ‘সোভিয়েত’ প্রতিষ্ঠার শতবর্ষে

[মহান নেতা কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় প্রথম শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। সেই বিপ্লব সফল করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল রুশ শ্রমিক-চাষী জনতার নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে ওঠা গণকমিটি বা ‘সোভিয়েত’গুলি। কমরেড লেনিনের সুযোগ্য নেতৃত্বে ও বিপ্লবী বলশেভিক পার্টির পরিচালনায় এই সোভিয়েতগুলিই পরিণত হয়েছিল রুশ বিপ্লবের এক একটি শক্তিকেন্দ্রে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে। এ বছর অক্টোবরে সেই ‘সোভিয়েত’ প্রতিষ্ঠার ১০১ বছর পূর্তি হল। এই উপলক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে ওঠার পথে ‘সোভিয়েত’-এর সৃষ্টি, বিকাশ, পূর্ণতালাভ ও বিপ্লব সফল করার ইতিহাস। রাশিয়ার মাটিতে গড়ে ওঠা সোভিয়েতগুলির অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে আমাদের দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা-কর্মী-সংগঠকদের গণকমিটিগুলি গড়ে তুলতে ও যোগ্যতার সঙ্গে এগুলি পরিচালনা করতে সাহায্য করবে, প্রেরণা যোগাবে।

— সম্পাদক, গণদাবী।]

(৬)

পরিস্থিতি বুঝে ক্যাডেট, সোস্যালিস্ট-রেভোলিউশনারি ও মেনশেভিকরা সমস্বরে দাবি তুলল যে, বলশেভিকদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

৪ জুলাই রাত্রি থেকেই শুরু হল বলশেভিক সংগঠনগুলির ওপরে ফৌজি হামলা। ৫ জুলাই ভোরবেলা প্রাভদার সম্পাদকীয় দপ্তর ও তার ছাপাখানা তছনছ করে দিয়ে গেল মিলিটারি ক্যাডেটরা। ৬ জুলাই অস্থায়ী গভর্নমেন্ট গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল লেনিন ও আরও অনেকের নামে। বলশেভিকদের সদর দপ্তর দখল করে বসল সরকারি ফৌজ। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যাতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষে প্রচার চলতে না পারে, সর্বপ্রকারে তার ব্যবস্থা করা হল। কেরেন্‌স্কির গোয়েন্দা দল সারা শহর তোলপাড় করে বলশেভিক পার্টির নেতাদের সন্ধান করতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ’ল লেনিনের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের অভিযান। বলা হতে লাগল যে, লেনিন হচ্ছেন জার্মানদের বেতনভুক গুপ্তচর। একদল লোকও পাওয়া গেল, যারা লেনিনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দলিলপত্র সহ প্রমাণ করতে প্রস্তুত।

লেনিন আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেন। জারের আমলের মতো অস্থায়ী গভর্নমেন্টের আমলেও গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য গোপন ঠিকানায় আশ্রয় নিতে হল তাঁকে। ঠিকানার পর ঠিকানা বদলের পর, শেষপর্যন্ত স্ট্যালিনের প্রথম স্ত্রীর বাবা, পোড়খাওয়া বলশেভিক আলুলায়েভ লেনিনকে লুকিয়ে রাখেন। এই সময়ে বাইরের বিপ্লবী কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লেনিন স্থির করেন, আদালতকে ব্যবহার করে তিনি বিপ্লবের আহ্বান প্রচার করবেন এবং সেজন্য ধরা দেবেন। ক্রুপস্কায়া লিখেছেন, সেই মুহূর্তে লেনিন যেন বিচলিত হয়েছিলেন। সমস্তই স্থির হয়ে গিয়েছিল, লেনিন পরবর্তী কার্যভার নেতাদের বুঝিয়েও দিয়েছিলেন। পরদিন ভোরে আত্মসমর্পণ। সন্ধ্যায় এলেন স্ট্যালিন। তিনি লেনিনকে বোঝালেন — ওরা আপনাকে বলার সুযোগ দেবে না, সোজা গুলি করবে। বিচারই করবে না। কোন নেতা যা পারেন নি, তা পারলেন স্ট্যালিন। লেনিন সিদ্ধান্ত বদল করলেন। ক্রুপস্কায়া লিখেছেন, বাস্তবে স্ট্যালিন তাঁর প্রাণরক্ষা করেন। এবার ফিনল্যান্ডের সীমান্তের কাছে একটি হ্রদের ধারে ঘন জঙ্গলের মধ্যে জলাভূমিতে লেনিনকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল নিরাপত্তার কারণে। সেখান থেকেই তিনি বলশেভিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠাতেন, রাশিয়ার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পুস্তিকা ও প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে লাগলেন।

মার্কিন সাংবাদিক আলবার্ট এই সময়কার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে লেখেন ঃ বলশেভিকদের সফলতা যেমন বাড়ছে, তেমনি তাদের বিরুদ্ধে হৈচৈও উঠছে উচ্চনাদে। বুর্জোয়া প্রেস অন্য পার্টিগুলোর চিন্তাভাবনা ও মধ্যপন্থার যখন প্রশংসা করছে, তখন বলশেভিকদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করছে। ‘বাবুস্কা’ ও কেরেন্‌স্কিকে থাকার জন্য রাজকীয় শীতপ্রাসাদ দেওয়া হয়েছিল, অন্যদিকে বলশেভিকদের পাঠানো হচ্ছিল কারাগারে। অতীতে সমস্ত পার্টিকেই তাদের নীতির জন্য ভুগতে হয়েছিল। এখন ভুগতে হচ্ছে বলশেভিকদের। তারা আজকের দিনের শহীদ। এটাই তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ তাদের মুখ্য চরিত্র করে তুলছে। বলশেভিক তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করে জনগণ এই তত্ত্বের মধ্যেই তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখতে পেয়েছে।

জনগণের মধ্যে বলশেভিকদের প্রভাব বাড়লেও সোভিয়েতগুলির অধিকাংশের নেতৃত্ব তখনও শোধনবাদী মেনশেভিক ও সোস্যালিস্টদের দখলে। সেই সোভিয়েতগুলি তখন বাস্তবে বুর্জোয়া কেরেনস্কি সরকারেরই সমর্থক শাখায় পরিণত হয়েছে। এদের দ্বারা বুর্জোয়া সরকার উচ্ছেদের লড়াই অসম্ভব। এই অবস্থায় ‘সোভিয়েতের হাতে সকল ক্ষমতা চাই’ স্লোগানের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, কার্যত বুর্জোয়া সরকারের প্রতি সমর্থন।

তখন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আত্মগোপনে থেকেই লেনিন তাঁর ‘স্লোগান প্রসঙ্গে’ পুস্তিকায় লেখেন ঃ ‘সোভিয়েতের হাতে সকল ক্ষমতা চাই’ — এই স্লোগান অল্প সময়ের জন্য হলেও মুলতুবি রাখতে হবে। এখন এই স্লোগান সঠিক নয়, কেন না, সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারি এবং মেনশেভিক পার্টিগুলি সোভিয়েতের ওপরে আধিপত্য করছে এবং তার ফলে সোভিয়েত ব্যর্থ হয়েছে। এখন যদি ডাক দেওয়া হয় যে, সোভিয়েতের হাতে রাষ্ট্রশক্তি তুলে দেওয়া হোক, তা হবে জনগণের প্রতি প্রতারণার সামিল।

লেনিন বললেন, তার মানে এই নয় যে, বলশেভিক পার্টি সোভিয়েত ধরনের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধী। রুশ বিপ্লবের নতুন অভ্যুত্থান ঘটবে এবং সর্বক্ষমতাসম্পন্ন সোভিয়েতের আবির্ভাব ঘটবে। এখনকার মতো সোভিয়েত নয়। এখনকার সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারি ও মেনশেভিকদের আধিপত্যে হয়ে পড়েছে বুর্জোয়াদের লেজুড়। শীঘ্রই এমন সোভিয়েতের আবির্ভাব ঘটবে — যা হবে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের হাতিয়ার।

১৯১৭ সালের ২৬ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত পেত্রোগ্রাদে অনুষ্ঠিত হল বলশেভিক পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস। লেনিন উপস্থিত থাকতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলি হয়ে উঠল কংগ্রেসের আলোচনার ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি। কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন।

জারতন্ত্রের উৎখাত হবার পাঁচ মাস পরে বলশেভিকদের এই পার্টি কংগ্রেস। কংগ্রেসে প্রতিনিধি এসেছিলেন ২৮৫ জন। এ সময়ে পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ২,৪০,০০০। ৩ জুলাইয়ের আগে পার্টির যখন বৈধ অস্তিত্ব ছিল, পার্টি প্রকাশিত পত্রিকার মোট সংখ্যা ছিল ৪১। প্রতিনিধিদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, জেলাগুলিতে সোস্যালিস্ট-রেভোলিউশনারি ও মেনশেভিকদের প্রভাব কমছে, শ্রমিকদের ও সৈনিকদের মোহভঙ্গ হচ্ছে, তাঁরা ক্রমেই বেশি সংখ্যায় ঝুঁকছেন বলশেভিক পার্টির দিকে।

এই সময় এল শীত। রাশিয়ার শীতের অভিজ্ঞতা যার আছে, একমাত্র সে-ই বুঝতে পারে — কী ভয়ঙ্কর সেই শীত। সেই সময়কার অবস্থা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে মার্কিন সাংবাদিক আলবার্ট আর উইলিয়ামস্‌-এর বর্ণনায়। তিনি লিখেছেন ঃ

আবার একটা শীত এল রাশিয়ার বুকে। উত্তর থেকে ধেয়ে আসা রাশিয়ার ভয়ঙ্কর শীতকে সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলো দু’হাত তুলে অভিনন্দিত করে, অন্যদিকে এই শীত বিপুল জনগণের দুর্ভোগ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। যত শীত বাড়ে, খাদ্য ও জ্বালানি তেলের দাম তত বাড়তে থাকে। রেশনে মাথাপিছু রুটির পরিমাণও তত কমে। সারা রাত বরফ পড়া রাস্তায় রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপতে থাকা মেয়েদের মিছিল ক্রমাগত দীর্ঘ হয়। কারখানার পর কারখানায় মালিকদের লকআউট ঘোষণা এবং প্রতিবাদী শ্রমিকদের ধর্মঘট তীব্র হয়ে ওঠে। জনগণের অন্তর কানায় কানায় ভরে যায় সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণার বিষে। ভাইবর্গের এক শ্রমিকের কণ্ঠে তারই প্রতিধ্বনি ঃ “শান্ত হও, শান্ত হও — ওরা সর্বদাই আমাদের বুঝিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের শান্ত করবার জন্য তারা কী করেছে? কেরেন্‌স্কি সরকার কি আমাদের জার শাসকদের থেকে বেশি খাদ্য দিচ্ছে? শুধু বেশি বেশি কথা আর প্রতিশ্রুতি, বেশি খাদ্য কই? সারা রাত ধরে আমরা জুতো, রুটি ও মাংসের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি, বোকার মত আমরা আমাদের ব্যানারে লিখেছি ‘স্বাধীনতা’। কিন্তু একটিই মাত্র স্বাধীনতা তো আমরা পেয়েছি — সেই পুরনো দাসত্ব এবং অনাহারের স্বাধীনতা।”

অন্যদিকে, সর্বত্রই ফাটকাবাজির রমরমা। খাদ্য বোঝাই ট্রেনগুলো লুট হয়ে যাচ্ছে, ছাপাখানা থেকে টাকা ছাপা হয়ে স্রোতের মত বাজারে আসছে; রাতের জীবন এবং জুয়া-হলগুলো পূর্ণোদ্যমে চলছে। বুর্জোয়ারা নির্মম অত্যাচারী জেনারেল কর্নিলভকে মহান দেশপ্রেমিক বলে প্রচার করছে। তারা বরং প্রার্থনা করছে যে, জার্মানরা এসে রাশিয়া দখল করুক এবং বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র পেট্রোগ্রাদকে সমগ্র রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিক। রুশ পার্লামেন্ট ডুমা’র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রডজিয়াঙ্কো নির্লজ্জভাবে লিখল, “জার্মানরা এসে পেট্রোগ্রাদ দখল করুক। তারা এসে রুশ নৌবহর ধ্বংস করবে ঠিকই, কিন্তু সেইসঙ্গে তারা সোভিয়েতেরও কণ্ঠরোধ করবে।” রাশিয়াকে বিদেশিদের হাতে তুলে দেবার এই মতলব ক্ষিপ্ত করে তুলল রুশ জনগণকে।

এই পরিস্থিতির বর্ণনা করে ঐ সাংবাদিক লেখেন ঃ বিগত অক্টোবরের পাতাগুলো গাছ থেকে খসে পড়ছে, সেই সঙ্গে খসে পড়ছে সরকারের প্রতি জনগণের ন্যূনতম আস্থা-বিশ্বাস।

তিনি আরও লিখছেন ঃ ফলে শ্রমজীবী জনগণ সরকারের প্রতি হতাশ, মোহমুক্ত; তারা তাই বেপরোয়া, হিংস্র, কিন্তু ভীষণরকম সক্রিয়। শহরগুলোতে বিদ্রোহী কর্মচারীরা কোটিপতি মালিকদের তাদের অফিস থেকে বিতাড়িত করছে। ম্যানেজাররা এসব থামাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদেরকেও বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। যন্ত্রপাতি অচল, মালপত্র নষ্ট, কলকারখানা স্তব্ধ। সেনাদলের সেনারা তাদের বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে এবং হাজারে হাজারে রণাঙ্গন ত্যাগ করছে। সামরিক গোয়েন্দারা তাদের থামাতে বারংবার আবেদন করছে। কিন্তু সেই আবেদন ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে সৈন্যরা ঘোষণা করছে, “১ নভেম্বরের মধ্যে যদি যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি স্থাপনের জন্য কোন কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত না হয় তবে সমস্ত ট্রেঞ্চ ফাঁকা হয়ে যাবে। সমগ্র সেনাবাহিনী রণাঙ্গন ত্যাগ করে চলে যাবে।” গ্রামগুলোতে চাষীরা জমিদারী দখল করে নিচ্ছে; জমিদারেরা প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। যারা শান্ত হতে বলছে, চাষীরা তাদের হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে। গ্রামে গ্রামে সেনা পাঠানো হয়েছে চাষীদের বিদ্রোহ দমনের জন্য। রাশিয়া কার্যত নরকের দিকে ছুটে চলেছে।

এই দুর্দশা ও ধ্বংসের উপর রাজত্ব করছে অস্থায়ী কেরেন্‌স্কি সরকার — যা বাস্তবে একটা অচল মৃতদেহ। জনগণের সকল দাবির জবাবে তারা বলছে — সবুর কর, সব দেব। কিন্তু জনগণের সবুর সইছে না। সরকারের উপর থেকে তাদের বিশ্বাসের শেষ বিন্দুটুকুও হারিয়ে গেছে। তাদের এখন এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, একমাত্র তারাই ধ্বংস ও অন্ধকারের গ্রাস থেকে রাশিয়াকে রক্ষা করতে পারে; নিজেদের হাতে গড়া সংগঠনগুলোর উপরই তাদের একমাত্র বিশ্বাস। নিজেদের মধ্য থেকে সৃষ্ট নতুন নেতৃত্বের দিকেই তাদের লক্ষ্য; তাই সোভিয়েতগুলোর উপরেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ।

ভয়ঙ্কর শীতে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ যখন খাদ্যাভাবে, শীতবস্ত্রের অভাবে ধুঁকছে, মরছে, অন্যদিকে তখন জন রীড লিখছেন ঃ কবিতা লিখছিলেন কবিরা — কিন্তু বিপ্লব নিয়ে নয়। বাস্তববাদী শিল্পীরা রাশিয়ার মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে দৃশ্য আঁকছিলেন, এবং যাই আঁকুন বিপ্লব আঁকছিলেন না। মফস্বল থেকে তরুণী মহিলারা পেত্রোগ্রাদ শহরে আসছিলেন ফরাসি শিখতে ও সঙ্গীত চর্চা করতে, হোটেলের লবিতে ঘুরছিলেন সুদর্শন ফুর্তিবাজ তরুণ সব অফিসার...। আর, আমলাতন্ত্রে যারা একটু তলার দিকে তাদের বাড়ির গিন্নীরা অপরাহ্নে চায়ের আসরে জমায়েত হতেন, সঙ্গে নিজেদের সোনা রুপো জড়োয়া বাঁধাই ছোট চিনিদানি নিতে ভুলতেন না, আধখানা রুটিও থাকতো হাতে, এবং কামনা করতেন যেন জার ফিরে আসে, নয়ত আসুক জার্মানরা এবং এমন কিছু ঘটুক যাতে তাদের চাকর জোটানোর সমস্যার সমাধান হয়।...

আর এদের চারপাশে রাশিয়ায় তখন জন্ম নিচ্ছে এক নতুন জগত। গ্রীষ্ম এল। সোভিয়েতেগুলির বাড়-বৃদ্ধি দেখা গেল। প্রতিটি পেশার, প্রতিটি জনগোষ্ঠীর প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে সোভিয়েতগুলি মাথা তুলল। নিজেদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলিতে জনগণকে ট্রেনিং দেওয়া হতে লাগল।

জুলাই মাসে কেরেন্‌স্কি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী হলেন। বলশেভিক নির্মূলীকরণের কাজে কেরেন্‌স্কির দোসর হলেন রুশ সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল কর্নিলভ। জেনারেল কর্নিলভ রুশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন আগস্ট মাসের শেষদিকে। সর্বাধিনায়ক হয়েই স্থির করলেন, সৈন্যবাহিনীকে যদি ঠিক রাখতে হয়, তাহলে প্রভাব খর্ব করা দরকার সোভিয়েতের ও পেত্রোগ্রাদ বলশেভিকদের। বিরাট সৈন্যবাহিনী তিনি মোতায়েন করলেন পেত্রোগ্রাদে ও মস্কোতে। উদ্দেশ্য, শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলিকে ছত্রখান করা ও বলশেভিকদের খতম করা।

(চলবে)

ফলতা এসইজেড প্রমাণ করেছে কর্মসংস্থান একটি মিথ্যা প্রচার

চারের পাতার পর

করভারে জর্জরিত সাধারণ মানুষের উপর আরও কর বসিয়ে। এসইজেড প্রকল্পে এই হবে সাধারণ মানুষের লাভ।

শিল্পায়নের প্রবক্তারা যেমন সবক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ধুয়ো তুলে থাকে, এসইজেড প্রকল্পের ক্ষেত্রেও তা তোলা হচ্ছে। আমরা আগেই দেখিয়েছি, চীনের এসইজেডগুলি থেকে কেমন করে সেখানকার শ্রমজীবী মানুষ দ্রুত গ্রামের দিকে চলে যাচ্ছে মালিকদের শোষণ-বঞ্চনা-অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে। এ দেশে কী হবে তা আগামী দিনেই প্রকাশিত হবে। কিন্তু যে কয়েকটি এসইজেড চালু রয়েছে, তার কর্মসংস্থানের হাল কী তা একবার দেখা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে চালু এরকম একটি এসইজেড হল ফলতা। এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (EPZ) থেকে একে এসইজেড-এ পরিণত করা হয়েছিল। কী ধরনের কর্মসংস্থান এখানে হয়েছে? বিস্তারিতভাবে বিষয়টি একটু আলোচনা করা যাক।

ফলতা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের চেহারা

১৯৮৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় রাজ্য সরকার হুগলি নদীর পূর্বপাড়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ২৮০ একর জমি রাজ্যপালের বিশেষ ক্ষমতাবলে অধিগ্রহণ করে বিশেষ রপ্তানি অঞ্চল গঠন করে। জমির মালিকের একাংশ সামান্য ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল। বাকিরা এখনও কিছু পায়নি। কৃষিমজুর, বর্গাদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া তো দূর অস্ত্। যারা দখলিসত্ত্বে জমির চাষাবাদ করত তাদেরও কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। বাস্তুহারাদের জন্য রাজ্য সরকার একটা কলোনি গড়ে দিয়েছিল, কিন্তু তা বাসের অযোগ্য। বর্তমানে ঐ কলোনি জনশূন্য। কয়েকটি পরিবার কোনও ব্যবস্থা করতে না পারার কারণে কোনমতে টিকে আছে।

বাস্তবে জমির মালিকদের এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল সাধারণ মানুষকে জোর করে উচ্ছেদ করা হলেও এই বিশেষ রপ্তানি অঞ্চলে ব্যবসায়ীদের কিন্তু সরকার উদার হস্তে সহায়তা বিতরণ করেছে। এই অঞ্চলে ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী শর্তে জমি ইজারা দেওয়া হয়েছে। জমি ইজারার হার হ'ল বছরে ১৬ টাকা প্রতি ১০০ বর্গ মিটার। কেউ যদি কারখানার শেড বানায় তবে তাকে বর্গমিটার পিছু বছরে মাত্র ১৬০ টাকা দিতে হবে। কেউ যদি কারখানা বানায়, আর সেই কারখানায় যদি ৩০ হাজার বর্গমিটার পর্যন্ত জমি লাগে তবে তাকে বছরে হাজার বর্গমিটার পিছু দিতে হবে মাত্র ২৬০ টাকা। জল দেওয়া হবে জলের দামে, প্রতি এক হাজার লিটার মাত্র ২ টাকা ৫০ পয়সায়।

যাই হোক, ২০০০ সালে এই ফলতা ইপিজেডকে এসইজেড অঞ্চলে পরিণত করা হয়। তার ফলে এই এলাকায় দেশের শ্রম আইন প্রযোজ্য নয়। সরকার অর্ডিন্যান্স করে এই সব এলাকার জন্য ভয়াবহ শ্রম আইন চালু করেছে এবং সরকার মহা উৎসাহে তা কার্যকর করছে। অবশ্য ২০০৫ সালের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন চালুর পর এই অর্ডিন্যান্সগুলির আর কোন প্রয়োজন নেই। এ অঞ্চলে কাজের সময় অনেক বেশি। বাড়তি কাজের জন্য কোন বাড়তি মজুরি নেই। ঠিকা শ্রমিককে সারা জীবন ঠিকা শ্রমিক রেখে কাজ করানো যাবে। কোন শ্রম আইনই তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। উৎপাদন বোনাস, পি এফ, গ্রাচুইটির বালাই নেই, ট্রেড ইউনিয়ন করার বা প্রতিবাদ করার কোন অধিকার নেই।

স্থায়ী কর্মীদের অবস্থাও ভাল নয়। দু'একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১০০ জনের কম স্থায়ী কর্মী যেসব কারখানাতে আছে, মালিক মনে করলেই সে সব কারখানা কোন কারণ না দেখিয়েই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিতে পারে। একজন গড়পড়তা দক্ষ শ্রমিক মাসে রোজগার করে দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা। এই হ'ল অবস্থা।

ফলতার এই এসইজেড অঞ্চলে মোট ইউনিটের সংখ্যা ১১৭। এর মধ্যে ট্রেডিং ইউনিট সর্বাধিক। এরা কোন কিছু উৎপাদন করে না, কেবল দালালির টাকা পায়। এই দালালির ইউনিটগুলোর জন্য সরকার দুটো জেটি, দুটো বড় রাস্তা, দুটো ব্যাঙ্ক, সঞ্চার ব্যবস্থা (যার খরচ কম, সরকার প্রচুর ভর্তুকি দেয়) করদাতা ও গরিব জনগণের টাকায় গড়ে দিয়েছে। এসব কাজ করতে রাজ্য সরকারের খরচ হয়েছে কত টাকা? কমবেশি ৭০০ কোটি টাকা (১৯৮০-৮১-র টাকার মূল্যমানে)। কিন্তু চাকরি হয়েছে ক'জনের? মাত্র ৪০০ জনের। এ ছাড়া ঠিকাদার মারফত কিছু অস্থায়ী কর্মী কাজ করে থাকেন। ফলতার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের কর্মসংস্থানের নমুনা হ'ল এইরকম। অন্যত্র বিষয়টা ভিন্নরকম হবে, এটা ভাবা যায়?

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আর একটা গুরুতর প্রশ্নও কিন্তু ভেবে দেখা দরকার। যত কম হোক, এসইজেড অঞ্চলে কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হবে, একথা ঠিক। কিন্তু এই কর্মসংস্থান অনেকগুণ বেশি মানুষের কর্মহানির কারণ হিসাবেও দেখা দেবে। কেন একথা বলা হচ্ছে?

প্রথমত, এসইজেড প্রকল্প গঠনে যে বিপুল পরিমাণ কৃষিজমি অধিগ্রহণ করতে হবে সেখানকার কৃষক-খেতমজুর-দিনমজুর-বর্গাদার — এরা সবাই কর্মচ্যুত হবে। এই সংখ্যাটা বিশাল। তথাকথিত এসইজেড প্রকল্পের শিল্পস্থাপনে সেই ক্ষতিপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। ফলতার ক্ষেত্রেই দৃষ্টান্ত সহকারে একথা আমরা বলেছি।

দ্বিতীয়ত, ওদের কথামত এসইজেড প্রকল্পে যদি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প স্থাপিত হয় তবে তা হবে উচ্চপ্রযুক্তিসম্পন্ন পুঁজিপ্রধান। এর ফলে ঐ সমস্ত শিল্পে উচ্চ কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরাই কাজ পেতে পারে — যারা হবে মূলত ধনী ঘরের সন্তান। উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া ঘরের ছেলেমেয়েদের বাস্তবে এখানে কাজ পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ভাবা দরকার। নানা করমুক্ত উচ্চপ্রযুক্তিসম্পন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের কম উৎপাদন খরচের পণ্য যদি জাতীয় শুল্ক এলাকায় প্রবেশ করে, তবে সেখানকার পণ্য তার সাথে প্রতিযোগিতায় পিছু হঠবে এবং এই সমস্ত এলাকার ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের লালবাতি জ্বালার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেবে। ফলে এসইজেড এলাকায় যত লোক কাজ পাবে, জাতীয় শুল্ক এলাকায় তার দশগুণ-বিশগুণ লোক কাজ হারাবে। তাই এসইজেড এলাকার ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প জাতীয় শুল্ক এলাকার ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পকে ধ্বংস করে দেশে নতুন করে কর্মচ্যুত বেকার বাহিনীর জন্ম দেবে। এই হবে ওদের বহুকথিত কর্মসংস্থানের বাস্তব চেহারা। তাই বলা যায়, এসইজেড গঠন দেশি-বিদেশি কর্পোরেট সংস্থার লুঠের বাজার খুলে দেওয়ার প্রয়োজনে নতুন এক বিশাল আয়োজন এবং জনসাধারণকে ধ্বংস করেই তা করা হবে।

আমরা জানি, বিশ্বপুঁজিবাদ অভূতপূর্ব সঙ্কটে দীর্ণ। তার সঙ্কট এবেলা-ওবেলা। পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মে যতটুকু পুঁজি প্রতিদিন সঞ্চিত হচ্ছে তা বিনিয়োগ করার জায়গা নেই। তাই অলস পুঁজি শেয়ার বাজারের ফাটকা কারবারে খাটছে। এর পরিমাণ নিয়ত বাড়ছে। এখন রিয়েল এস্টেট ব্যবসা করে এই পুঁজি বাঁচতে চাইছে। প্রচার চলছে — রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় এখন তেজি ভাব। আর পুঁজি যেখানে মুনাফার গন্ধ পায় সেখানেই ছুটে যায়। প্রথমে উদ্যোগপতিরা হয়তো কিছু মুনাফা পকেটে পুরতে পারে, তারপরে দেখা যায় বহু পুঁজির ভিড়ে মুনাফার স্বপ্ন বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। এসইজেড প্রকল্পের ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা প্রবল। এসইজেড-এ প্রচুর মুনাফা আসবে, এই সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে দেশি-বিদেশি অলস পুঁজি এই ক্ষেত্রে ধেয়ে আসছে। মুনাফার নানা অঙ্ক ও হার কষা হচ্ছে। কিন্তু এই প্রকল্প পূর্ণগতিতে ছোটার আগেই কিন্তু সঙ্কটের কালো ছায়া দেখা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা রাজস্থানের অবস্থা দেখেই আঁতকে উঠছেন। সেখানে ২৪টি এসইজেড প্রকল্পের ১ লক্ষ ৩০ হাজার একর জমিতে যত শিল্প এলাকা তৈরি হবে, তাতে বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে ৪৫ লক্ষ কোটি টাকা। গত পাঁচ বছর এদেশে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়েছে এর ৭ শতাংশ মাত্র। তাই তাঁরা বলছেন — এত বিনিয়োগ আসবে কোথা থেকে, করবে কে, কারা, কেন? ফলে এসইজেড গঠনের হিড়িক মুখ থুবড়ে পড়বে। দেশি-বিদেশি পুঁজির উন্নয়নের ফানুস ফেটে যাবে, শুধু জনগণের জীবনে রেখে যাবে অসীম অন্ধকার। পুঁজিবাদ এর থেকে বেশি আর কী-ই বা দিতে পারে! ফলে, একে প্রতিরোধ ছাড়া জনগণের সামনে অন্য কোন বিকল্প নেই।

কৃষিজমি দখল করলে প্রতিরোধ হবেই

একের পাতার পর

ডেভেলপমেন্ট অথরিটিও দায়ী।

এই আন্দোলনে নকশালদের ভূমিকা সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, এখানে নকশালদের কোন সংগঠন নেই। কোথাও কিছু ঘটলে বাইরে থেকে মাঝে মাঝে খবর পেয়ে ইউনিভার্সিটির বা কলেজের কিছু ছেলে ঘটনাস্থলে যায়। নন্দীগ্রামেও যারা ধরা পড়েছে তারা সবাই বাইরে থেকে গিয়েছিল। ঘটনার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। অথচ সবসময়ই উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমাদের দলের সাথে নকশালদের নাম যুক্ত করে দেওয়া হয়। আমাদের দলকে জনগণ জানে। আমরা বোমাপিস্তলের কারবার করি না। আমরা সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল, নৈতিকতায় বলীয়ান আন্দোলন গড়ে তুলি, গণপ্রতিরোধ করি। নন্দীগ্রামের একটা ঐতিহ্য আছে। স্বাধীনতা আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, নন্দীগ্রাম উন্নয়ন পরিষদের নেতৃত্বেও ইতিপূর্বে বহু আন্দোলন হয়েছে। ঐ অন্দোলনেও নন্দীগ্রামের মানুষ চারদিক ঘিরে রেখেছিল, পুলিশ যাতে না ঢুকতে পারে। ফলে রাজ্য সরকারকে জানাতে চাই, আপনারা আগুন নিয়ে খেলছেন। আপনারা টাটাদের জন্য, সালিমদের জন্য, আম্বানিদের জন্য, পবন রুইয়াদের জন্য যে কৃষিজমি দখল করছেন, রাজ্যের জনগণ কিছুতেই তা মানবে না। নন্দীগ্রাম থানায় এসইজেডের জন্য যে বিশাল পরিমাণ জমি সরকার দখল করতে চাইছে তাতে মন্দির ১১২, মসজিদ ৪২, ঘরবাড়ি ২৫ হাজার, প্রাথমিক স্কুল ১২৭, হাইস্কুল ৪, হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ৩, মাদ্রাসা ৩ এবং ছোটবড় ১৩টি বাজার ধ্বংস হবে। এটা জনগণ কখনও মানতে পারে? এই এলাকার এমএলএ সিপিআই দলের, পঞ্চায়েত ও সমিতি সিপিএমের। এবং এই যে লোক জড়ো হচ্ছে তার অধিকাংশই সিপিএমের সমর্থক। কিন্তু আজ কে সিপিএম, কে কংগ্রেস, কে এস ইউ সি আই, এই পার্থক্য জনগণের মধ্যে নেই। চাষের জমি রক্ষা করাই এই আন্দোলনের মর্মবস্তু। আজ দরকার এই মানুষগুলিকে ভলান্টিয়ার ও গণকমিটি করে সংগঠিত করা, আমরা সেটাই করছি।

সিঙ্গুর আন্দোলন প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সিঙ্গুরেও গণকমিটি, যুব ও মহিলা কমিটি গড়ে আমাদের দলই লড়াই করছে। অন্য জেলাতেও আমরা লড়ছি। তৃণমূল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সিঙ্গুরে তৃণমূলের বহু কাজকর্ম আমরা সমর্থন করি না। বিশেষ করে আন্দোলন যখন একটা ব্যাপকতর রূপ নিচ্ছিল, ৫ ডিসেম্বর সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালের পর জেলায় জেলায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছিল, সে সময় আচমকা মমতা ব্যানার্জীর অনশনের ফলে আন্দোলনের পরিবেশ অন্যরকম হয়ে গেল। অনশনমুখী হয়ে গেল আন্দোলন। সিপিএমের মতো একটি সরকার, যারা ফ্যাসিস্ট কায়দায় আন্দোলন দমন করছে, তাদের শাসনে দাবি আদায় করতে হলে আমরা মনে করি, পুঁজিবাদবিরোধী লক্ষ্যকে সামনে রেখে মার্কসবাদী লেনিনবাদী বিপ্লবী আদর্শকে হাতিয়ার করে সুশৃঙ্খল, সুসংগঠিত নৈতিক দিক থেকে বলীয়ান আন্দোলনের মধ্য দিয়েই করতে হবে। আমরা জনগণকে বলছি, লড়াইটা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। দেশিবিদেশি একচেটিয়া পুঁজি, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি — তারাই কৃষিজমি দখল করছে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করার জন্য। সিপিএম কোনদিনই মার্কসবাদী দল ছিল না; অতীতে যতটুকু বামপন্থার চর্চা করত, তাও গদির লোভে, টাকার লোভে বিসর্জন দিয়েছে। নেতৃত্বের এই ভূমিকা অধিকাংশ সিপিএম কর্মী মানতে পারছে না। তারা আমাদের আন্দোলন সমর্থন করছে — এটাই বাস্তব চিত্র। ফলে, এইভাবে দলমত নির্বিশেষে জনগণকে জড়িত করে যখন সিঙ্গুর আন্দোলনটা গ্রামে গ্রামে এলাকায় এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছিল, ব্যক্তির অনশনের ফলে তা কার্যত স্তিমিত হয়ে গেল। তখন ক'দিন অনশন চলবে, এটা নিয়েই সকলের উদ্বেগ দেখা দিল, জনতার দৃষ্টি সেদিকেই ঘুরে গেল। আন্দোলনটা বিপথগামী হয়ে গেল। এর দ্বারা একজন ব্যক্তি প্রচার পেতে পারেন, ভোটের রাজনীতিতে তার সুবিধা হতে পারে, কিন্তু গণআন্দোলন এতে শক্তিশালী হয় না। তৃণমূলের নিচুতলার কর্মীরাও এটা চাননি। তারা আন্দোলনটাই চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল এরা কি আন্দোলনের লোক? এঁরা তো সবাই পুঁজিপতিশ্রেণীর কাজে দায়বদ্ধ। এঁদের অভিপ্রায় ছিল মূল দাবিটিকে গুলিয়ে দেওয়া এবং সেটাই ঘটল। তারা মূল দাবি থেকে সরে এলো। মূল দাবি ছিল, শিল্পের নামে কৃষিজমি নেওয়া চলবে না। দাবি শিফট হয়ে চলে এল, 'যারা অনিচ্ছুক তাদের জমি নেওয়া চলবে না।' সিঙ্গুরে কি জমি দিতে ইচ্ছুক কেউ ছিল? জমি থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু ব্যক্তি জমি দিয়েছিল। বাকি যারা জমি দিয়েছে তারা চাপে পড়ে, ভয়ে দিয়েছে। সিঙ্গুরে যে কৃষিজমি রক্ষা কমিটি হয়েছে আমরা তাতে আছি। সেখানে এখন তৃণমূল এই প্রস্তাব নিয়ে এসেছে যে 'যারা ইচ্ছুক নয়, তাদের জমি ফেরত দেওয়া হোক।' আমরা এটা সমর্থন করি না। কারণ গোটা আন্দোলনটা হয়েছে কৃষিজমি নেওয়া চলবে না — এই দাবিতে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, গোটা রাজ্যব্যাপী আমরা চাইছি গণকমিটি গড়ে তুলে, ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলে জনগণ সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে লড়াই করবে। এখানে কোনরকম হঠকারি পথ আমরা সমর্থন করি না। আমরা সেভাবেই আন্দোলন করে যাচ্ছি। নন্দীগ্রামেও সেভাবেই আন্দোলন চালাচ্ছি এবং অন্যত্রও এভাবেই আন্দোলন চলবে।

আটের পাতায় দেখুন

ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এস এফ আই, সিপি, টিএমসিপি'র সন্ত্রাসের মুখে দাঁড়িয়ে এ আই ডি এস ও'র জয়

এ রাজ্যে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বেশ কিছু কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এ আই ডি এস ও প্রার্থীরা উল্লেখযোগ্য জয়লাভ করেছেন। এস এফ আই এবং কিছু কিছু জায়গায় টি এম সি পি গায়ের জোরে নমিনেশন পেপার পর্যন্ত তুলতে বাধা দিয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও এ আই ডি এস ও প্রার্থীরা যেখানেই লড়তে পেরেছেন সেখানেই তাদের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের সমর্থন লক্ষ করা গেছে।

যোগমায়া দেবী কলেজে এ আই ডি এস ও পরিচালিত প্রায় ৫০ বছরের ছাত্র সংসদকে ভাঙতে এস এফ আই তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কলেজের অধ্যক্ষার বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের দাবি নিয়ে এ আই ডি এস ও আন্দোলনে নামে। নানা টালবাহানার পর কলেজের অধ্যক্ষা অবশেষে ছাত্রী সংসদ নির্বাচনের নোটিশ দিতে বাধ্য হন। কলেজের ছাত্রীরা এ আই ডি এস ও-কে বিপুলভাবে সমর্থন করছে দেখে এস এফ আই মহিলা কলেজে নমিনেশন পেপার তোলার জন্য এলাকার মস্তান এবং তাদের সংগঠনের ছেলেদের জড়ো করে। কলেজের অফিসের সিপিএম-এর দু'জন কর্মচারীর মাধ্যমে কলেজের অ্যাডমিশন রেজিস্টার বাইরে নিয়ে গিয়ে তার থেকে ছাত্রীদের ঠিকানা, ফোন নম্বর জোগাড় করে এস এফ আই নেতারা এ আই ডি এস ও'র প্রার্থী না হওয়ার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিতে থাকে। কলেজের সামনে এবং দু'টি বিল্ডিংএর মধ্যবর্তী রাস্তায়ও তাদের হুমকি চলতে থাকে। এমনকী সিপিএম সমর্থক কমার্সের একজন পার্টটাইম শিক্ষক ক্লাসে ছাত্রীদের হুমকি দেন। অধ্যক্ষা এই সমস্ত অভিযোগ শুনেও নীরব থাকেন। উল্টে নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকেন নির্বাচন স্থগিত করে দিতে। এত চেষ্টা করেও এস এফ আই শেষপর্যন্ত তাদের পক্ষে একটি ছাত্রীকেও না পেয়ে রণে ভঙ্গ দেয়। এ আই ডি এস ও প্রার্থীরা সমস্ত ক্লাসে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়। এর আগে মুরলীধর গার্লস কলেজেও এ আই ডি এস ও প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন।

হুগলি জেলার শ্রীরামপুর গার্লস কলেজে ছাত্রী সংসদ নির্বাচনে এ আই ডি এস ও প্রার্থীরা সব ক'টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। এস এফ আই-এর ছেলেরা বাইরে থেকে নানাভাবে চেষ্টা করেও একজনও প্রার্থীকে দাঁড় করাতে পারেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাধারণ সম্পাদিকা পদে নির্বাচিত হয়েছেন সিঙ্গুরে কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের কর্মী কমরেড পরশমণি মাইতি।

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর কলেজে সমস্ত ভয়ভীতি, সন্ত্রাস এবং টাকার খেলাকে উপেক্ষা করে ছাত্রছাত্রীরা এ আই ডি এস ও প্রার্থীদের ১৯টি আসনে জয়ী করে। টি এম সি পি ১২টি এবং এস এফ আই ৯টি আসন পায়। এ আই ডি এস ও'র জয়কে ঠেকাতে এস এফ আই এবং টি এম সি পি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ছাত্রছাত্রীদের হুমকি দেয়। এমনকী একজন এ আই ডি এস ও প্রার্থীকে টাকার লোভ দেখানোর চেষ্টা করে এস এফ আই। সে ঘৃণাভরে প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই নির্লজ্জতার কথা প্রকাশ করে দেয়। ভোটার পিছু টাকার প্রস্তাবও ছাত্রছাত্রীদের দিতে থাকে এই দুই সংগঠন। শেষপর্যন্ত নির্বাচনে পরাজিত হয়ে দুই সংগঠন মিলে অনৈতিক আঁতাত করে ছাত্র সংসদ দখলের চেষ্টা করতে থাকে। সরাসরি জয়ী প্রার্থীদের টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এস এফ আই এবং টি এম সি পি'র সাধারণ সমর্থকদের কাছে এই আঁতাতের খবর পৌঁছালে তারা নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। এস এফ আই - টি এম সি পি'র গোপন আঁতাতের ফলে ২৩ ডিসেম্বর সংসদ গঠনের দিনে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে টি এম সি পি তাদের ১২টি ভোটই এস এফ আইকে দিয়ে এস এফ আই প্রার্থীকে জয়ী করে। এই খবর বাইরে এলে তাদের সমর্থকদের ক্ষোভের আঁচ পেয়ে দুই সংগঠনই নির্বাচন কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এরপর এ আই ডি এস ও প্রার্থীরা সাধারণ সম্পাদক সহ সমস্ত পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়।

পুরুলিয়া জেলারই নিস্তারিণী কলেজে অধ্যক্ষার প্রত্যক্ষ মদতে বছরের পর বছর ছাত্রীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। এবছরও কোনও নোটিশ না দিয়ে গত ১২ ডিসেম্বর বহিরাগত ছেলেদের সাহায্যে হস্টেলের ছাত্রীদের জোর করে সকাল ৭টা থেকে নমিনেশন পেপার তোলার লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এ আই ডি এস ও'র সমর্থক ছাত্রীরা লাইনে দাঁড়াতে গেলে অধ্যক্ষা নিজে তাদের বাধা দেন। সকাল ১০.১৫টার পরে ছাত্রীরা জোর করে লাইনে দাঁড়ালে অধ্যক্ষার নির্দেশে পুলিশ এসে তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। বেলা ২টা পর্যন্ত সে লাইন এতটুকুও এগোয়নি। অথচ ভিতর থেকে এস এফ আই সমর্থক ছাত্রীদের হাতে নমিনেশন পেপার দিয়ে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে কলেজের অন্য একটি অনুষ্ঠানে এসডিও (সদর) এলে ছাত্রীরা তাঁকে ঘেরাও করে। তিনি এবং অধ্যক্ষা যৌথভাবে প্রতিশ্রুতি দেন বেলা ২টার আগে যারা লাইনে দাঁড়িয়েছে তাদের নমিনেশন পেপার দেওয়া হবে। বেলা ২টা বাজার কয়েক মিনিট আগে কলেজের একজন অধ্যাপক লাইনের শেষ থেকে নম্বর দিয়ে স্লিপ দিতে যান। অধ্যক্ষা-এসডিও-পুলিশ সকলের সামনেই এস এফ আই'র একজন মহিলা কর্মী ঐ স্লিপগুলি কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আর নমিনেশন দেওয়া হবে না বলে অধ্যক্ষা ঘোষণা করে দেন। ছাত্রীদের সম্মিলিত প্রতিবাদের ফলে পরে তিনি নির্বাচন স্থগিত রাখার ঘোষণা করতে বাধ্য হন। কিন্তু দু'দিন বাদেই ঐ নমিনেশন পেপার দেওয়ার প্রহসনটিকেই বৈধ বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, সিপিএম এবং অধ্যক্ষার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ধামাচাপা দিতে কিছু মনগড়া প্রার্থী খাড়া করে একটি নির্বাচনের নাটকের আয়োজন করা হয়। এ আই ডি এস ও'র ডাকে ছাত্রীরা ১৯ ডিসেম্বর কলেজে ধর্মঘট সর্বতোভাবে সফল করে এবং ২০ ডিসেম্বরের ভূয়ো নির্বাচন সম্পূর্ণ বয়কট করে।

ঐ জেলারই পঞ্চকোট রাজ মহাবিদ্যালয়ে প্রায় একই কায়দায় এ আই ডি এস ও-কে আটকানোর চেষ্টা করা হয়। এ আই ডি এস ও'র জমা দেওয়া বেশিরভাগ মনোনয়নপত্র বাতিল করলেও দু'টি আসনে লড়াই করে এ আই ডি এস ও একটি আসনে জয়লাভ করে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং কলেজে ক্ষমতাসীন ছাত্রপরিষদ স্থানীয় সিপিএমের সাথে হাত মিলিয়ে নির্বাচনের অনেক আগেই ব্যাপক সন্ত্রাস চালায়। এর মধ্যেও এ আই ডি এস ও'র প্রতি ছাত্রদের সমর্থন দেখে নির্বাচনের দিন ভোট গণনার সময় দু'টি আসনে এ আই ডি এস ও জয়ী হওয়ার পরে সিপি এবং স্থানীয় সিপিএম মস্তানরা কলেজ কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বাকী আসনগুলিতে কোন গণনাই করতে দেয়নি। বাকি আসনগুলিতে গণনা ছাড়াই ছাত্র পরিষদকে জয়ী বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়।

খড়্গপুর কলেজে গত ১৩ ডিসেম্বর নির্বাচনের দিনে স্থানীয় মাফিয়াদের সমর্থনপুষ্ট এস এফ আই বাহিনী কলেজে তাণ্ডব চালায়। কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ সহায়তায় প্রায় প্রতিটি ক্লাসেই এস এফ আই মস্তানরা প্রচুর ছাপ্পা ভোট দেয়। এর মধ্যেও এ আই ডি এস ও দু'টি আসনে জয়লাভ করলে এই মাফিয়াবাহিনী ছাত্রদের আক্রমণ করে। তাদের আক্রমণে এ আই ডি এস ও'র জয়ী প্রার্থী চন্দন মাহাত সহ বেশ কিছু ছাত্র আহত হয়। পরের দিন ১৪ ডিসেম্বর বনধের মধ্যে এস এফ আই মস্তানবাহিনী ছাত্রদের মেসে চড়াও হয়ে এবং প্রকাশ্য রাস্তায় এ আই ডি এস ও সমর্থকদের আক্রমণ করলেও পুলিশ তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

ঐ জেলার গোপীবল্লভপুর কলেজে এস এফ আই-এর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা 'ছাত্র ঐক্য কমিটি' ছাত্র সংসদে জয়ী হয়। ছাত্র ঐক্য কমিটির জয়ে ডি এস ও কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপ কলেজে গত বছর এ আই ডি এস ও ১১টি আসনে জয়ী হয়েছিল। এবছর নির্বাচনের বহু আগে থেকেই স্থানীয় দুষ্কৃতীদের সঙ্গে নিয়ে এস এফ আই এবং স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্ব প্রবল সন্ত্রাসের পরিবেশ কায়েম করে। কয়েক মাস ধরে প্রায় প্রতিদিনই ছাত্রছাত্রীদের মারধর করা, হুমকি দেওয়া তারা চালিয়ে যায় এবং ১৯ ডিসেম্বর নির্বাচনের দিন এ আই ডি এস ও প্রার্থীদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনে। বাইরে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে উপস্থিত থাকা এস ডি পি'কে বারবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও তিনি কোন ব্যবস্থা নেননি। কলেজের অধ্যক্ষকে বারবার বলা সত্ত্বেও কোন প্রতিকার হয়নি। এতদ্‌সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এরপর ভোট গণনার সময় চলে নতুন খেলা। ভোট গণনার দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রাক্তন এস এফ আই কর্মী আংশিক সময়ের শিক্ষকদের। ভোট গণনায় কারচুপি করেও যখন দেখা গেল যে এ আই ডি এস ও প্রার্থীরা জিতছে, তখন গণনা কক্ষ থেকে এ আই ডি এস ও প্রার্থীদের মেরে বের করে দেয় উপস্থিত এস এফ আই-এর গুণ্ডাবাহিনী। শেষ পর্যন্ত এ আই ডি এস ও ১টি আসনে জয়ী হয়েছে।

গ্যাংটক কলেজে এ আই ডি এস ও'র জয় ঃ সিকিমে এ আই ডি এস ও'র সাংগঠনিক কাজের সূচনা খুব বেশিদিনের নয়। ২০০৩ সালের সর্বভারতীয় সম্মেলনে প্রথম সিকিম থেকে কয়েকজন ছাত্র প্রতিনিধি আসেন। তারপর সেখানে রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। এ বছর সিকিমের একমাত্র কলেজ গ্যাংটক কলেজে ছাত্র সংসদের নির্বাচনে সভাপতি পদে এ আই ডি এস ও প্রার্থী জয়ী হয়েছে।

সাদ্দাম হুসেনের ফাঁসির প্রতিবাদে

রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভ

ঝাড়খণ্ড

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পরিচালিত ইরাকের পুতুল সরকারের আদালত কর্তৃক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনের ফাঁসির প্রতিবাদে গত ৩০ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে গোটা দেশ জুড়ে ধিক্কার দিবস পালনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। এর অঙ্গ হিসাবে ঐদিন অন্যান্য রাজ্যের সাথে ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলায় একটি বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। ছাত্র-যুব সহ প্রায় তিনশো সাধারণ মানুষ মিছিলে অংশ নেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্র থেকে শুরু হয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ পথ অতিক্রমা করে মিছিলটি স্টেশন চকে পৌঁছালে উচ্চকিত স্লোগানের মধ্য দিয়ে জর্জ বুশের কুশপুতুল পোড়ানো হয়। এরপর সিংভূম জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অভয় দাসের সভাপতিত্বে সেখানে একটি বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন, কমরেডস্‌ আশিস ধর, সরলা মাহাতো এবং মণিলাল মাঝি। বক্তারা ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন ও সাদ্দাম হুসেনের হত্যার তীব্র নিন্দা করেন এবং ইরাকের সংগ্রামী জনতার প্রতি সংহতি জানিয়ে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তাঁদের লড়াইয়ের সাফল্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেন।

ত্রিপুরা

৩০ ডিসেম্বর সাদ্দাম হুসেনের ফাঁসির প্রতিবাদে আগরতলার কর্ণেল চৌমুহনী থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বটতলায় এলে সেখানে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন, দলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেডস্‌ সুব্রত চক্রবর্তী ও শিবানী দাস। তাঁরা বলেন, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির সুযোগে সাম্রাজ্যবাদীরা নানা অজুহাতে বিভিন্ন দেশ আক্রমণ করে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করছে ও দেশ দখল করছে। এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আজ প্রয়োজন দেশে দেশে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা। বক্তারা সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার সঙ্গে ভারত সরকারের পারমাণবিক চুক্তি অবিলম্বে বাতিল করার দাবি জানান।

রাঁচিতে কলিঙ্গনগর দিবসে বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলন তীব্র করার শপথ

ওড়িশার কলিঙ্গনগরে গত বছর ২ জানুয়ারি টাটা কোম্পানির কারখানা গড়ার নামে পুলিশ ও টাটার গুণ্ডাবাহিনী গিয়েছিল জমি দখল করতে। সেদিনকার স্থানীয় আদিবাসীদের প্রবল আন্দোলন দমন করতে বর্বরতার সমস্ত সীমা পার করে গিয়েছিল। নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ১৩ জন আদিবাসীদের হত্যা করেছিল শুধু নয়, উন্মত্ত পুলিশ সেদিন নিহত আন্দোলনকারীদের যৌনাঙ্গ পর্যন্ত কেটে নিয়েছিল। কিন্তু তবুও সরকার সেই জমি দখল করতে পারেনি।

এ বছর ২ জানুয়ারি ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে কলিঙ্গনগরের শহীদদের স্মৃতিতে শহীদবেদী নির্মাণ করে মাল্যদান এবং পথসভা করা হয়। বক্তারা কলিঙ্গনগর ও সিঙ্গুরের লড়াই থেকে শিক্ষা নিয়ে বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলনকে আরও তীব্র করার শপথ নেবার আহ্বান জানান।

রাঁচিতে ফিরায়ানাল চকে ঐদিন শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন পার্টির রাজ্য সম্পাদক কমরেড হেম চক্রবর্তী সহ কমরেডস্‌ রবীন সমাজপতি, সিদ্ধেশ্বর সিং, অশোক সিং, কেয়া দে প্রমুখ। প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড সিদ্ধেশ্বর সিং।

পুরুলিয়ায় হাতির তাণ্ডবে মৃত্যু প্রশাসন নিষ্ক্রিয়

পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের জঙ্গল থেকে নেমে আসা খ্যাপা হাতির দৌরাত্ম্যে ঝালদা মহকুমার বেশ কিছু গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাতির তাণ্ডবে ইতিমধ্যেই ৩ জন মারা গেছে। ১০ জন গুরুতর আহত। নষ্ট হয়েছে বহু সবজী খেত ও ঘরবাড়ি। অথচ প্রশাসনিক স্তর থেকে গ্রামরক্ষায় কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এরই প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে জঙ্গল সীমান্তগুলিকে মোটা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা, মৃত ও আহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং রেঞ্জার অফিসগুলিতে ঘুমপাড়ানি বন্দুক সহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সবসময় মজুত রাখার সুনির্দিষ্ট দাবিতে এস ইউ সি আই ঝালদা সাংগঠনিক কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড তপন রজকের নেতৃত্বে ২৭ ডিসেম্বর ঝালদা রেঞ্জার অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। রেঞ্জার অফিসের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

কৃষক হত্যার প্রতিবাদে স্তব্ধ পশ্চিমবঙ্গ

একের পাতার পর

অত্যন্ত মারাত্মক। নন্দীগ্রামের মানুষ জমি দখল রুখতে পুলিশ প্রশাসনকে ঠেকাবার জন্য গ্রামের রাস্তা, ব্রিজ কেটে দিয়েছে। সিপিএম নেতারা বলছেন, এটা নাকি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পদ্ধতি নয়। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে এই পশ্চিমবঙ্গে লাগাতার গণআন্দোলন হয়েছে। আজকের অনেক সিপিএম নেতা সেই আন্দোলনে ছিলেন। তখন রাস্তায় গাছ ফেলে, রাস্তা কেটে ব্যারিকেড লড়াই লড়েছে জনগণ। ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এ জিনিস নতুন নয়, অগণতান্ত্রিক তো নয়ই।

৮ জানুয়ারি তমলুকে সর্বদলীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, নন্দীগ্রাম লাগোয়া অঞ্চলে যেসব ক্যাম্প সিপিএম তৈরি করেছিল, সেগুলিকে ৫ কিমি দূরে সরিয়ে নেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্তই প্রমাণ করে ঐ ক্যাম্পগুলো থেকেই আক্রমণ চালানো হয়েছে। বস্তুত সিপিএম নেতা বিনয় কোঙার ‘‘নন্দীগ্রামের মানুষের জীবন ‘হেল’ করে দেওয়া হবে’’ প্রকাশ্যেই এই হুমকি দিয়ে আক্রমণের প্ররোচনা দিয়েছেন এবং ঐ রাতেই সিপিএমের সশস্ত্র ক্রিমিন্যাল বাহিনী আক্রমণ চালিয়েছে। ৬টি মূল্যবান প্রাণ ঝরে গেছে। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন অনেকে।

আমরা বরাবরই বলছি, সরকারের এই সিদ্ধান্তকে একমাত্র গণআন্দোলনই রুখে দিতে পারে। এই আন্দোলনে মূল শত্রু কে? দেশীয় একচেটিয়া পুঁজি ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি। তারাই রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করে, জমির কারবার করে সহজে বিপুল মুনাফা লুঠতে চাইছে, সেজন্য হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ চাষীকে পথে বসাচ্ছে। এদেরই রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবে এ রাজ্যে কাজ করছে সিপিএম, অন্য রাজ্যে কোথাও কংগ্রেস কোথাও বিজেপি। সুতরাং দেশি-বিদেশি পুঁজির শোষণ-লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বৈপ্লবিক লক্ষ্য নিয়েই এই আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সেজন্যই সঠিক নেতৃত্ব চাই। সঠিক লক্ষ্য এবং সঠিক নেতৃত্ব— এই দুইয়ের সমন্বয়ে পরিচালিত হলেই একমাত্র আন্দোলন জয়যুক্ত হতে পারে। দরকার দল-মত নির্বিশেষে জনগণের ঐক্য। এজন্য যেখানেই সরকার কৃষিজমি দখলের ষড়যন্ত্র করছে, সেখানেই এস ইউ সি আই গণকমিটি ও আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করার উপর জোর দিচ্ছে। আজকের দাবি, কোথাও কৃষিজমিতে শিল্প করা চলবে না, অকৃষি-অনুর্বর ও বন্ধ কল-কারখানার জমিতে শিল্প স্থাপন করতে হবে।

৮ জানুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের দিন মহাকরণের সামনে এস ইউ সি আই-এর মিছিল

৯ জানুয়ারি শহীদ দিবস পালিত

নন্দীগ্রামের কৃষক শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ৯ জানুয়ারি রাজ্য জুড়ে শহীদ দিবসে বেলা ৩টার সময় ১ মিনিট নীরবতা পালিত হয়।

৮ জানুয়ারি হাজরা মোড়ে এস ইউ সি আই-এর মিছিল

বন্ধ কারখানার জমি দখল করা হচ্ছে না কেন

ছয়ের পাতার পর

আমাদের দলের রাজ্য কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেখানেই কৃষিজমি দখল করতে আসবে, সেখানেই আমরা জনগণকে নিয়ে প্রতিরোধ করব। আমরা আন্দোলনের হাতিয়ার পাবলিক কমিটি গড়ে তুলব। এখানে সিপিএম, বামফ্রন্টের অন্যদলের লোকজন, কংগ্রেস বা অন্যদলের লোকজন সকলেই থাকতে পারে। কিন্তু কোন দলের মতামত ঐ কমিটির উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। আমরা আমাদের প্রস্তাব ঐ কমিটির কাছে রাখব — কমিটি তা বিচার বিবেচনা করবে; তারাই সিদ্ধান্ত নেবে, তারাই ঠিক করবে। এভাবে সুসংগঠিত জনগণই আন্দোলন পরিচালনা করবে। যেমন ধর্মতলায় তৃণমূল মঞ্চে কৃষিজমি রক্ষা কমিটির ফেস্টুন এনে রাখা হয়েছিল, এটা আমরা সমর্থন করিনি।

সিপিএমের ‘শিল্পায়ন’ শিল্পায়ন’ প্রচার সম্পর্কে তিনি বলেন, রাজ্যে ৫৬ হাজার ছোটবড় কারখানা বন্ধ। সরকার শিল্পায়ন শিল্পায়ন বলছে, এই বন্ধ কারখানাগুলো খোলার ব্যবস্থা করছে না কেন? ১৫ লক্ষর ওপর শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গেছে। তাদের চাকরিতে পুনর্বহালে কী ব্যবস্থা হচ্ছে? ঢাকঢোল পিটিয়ে ডানলপ খোলা হয়েছে। সাত বছর বন্ধ ছিল, ৪০০০ শ্রমিক কাজ করত, খোলার সময় শিল্পপতি পবন রুইয়া বলল, ১০০০ শ্রমিক কাজ পাবে। কাজ পেয়েছে মেইন্টেন্যান্সের মাত্র কয়েকজন। গতকাল অসিত দাস নামে ডানলপের এক শ্রমিক অনাহারের জ্বালায় অত্মহত্যা করেছেন। সরকারকে আমরা বার বার বলেছি, পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-উত্তরবঙ্গের অকৃষি জমিতে শিল্প করার জন্য। বন্ধ কারখানার হাজার হাজার একর জমিতে কারখানা হতে পারে। ১৮৯৪ সালের যে আইনে সরকার জোর করে কৃষিজমি দখল করছে সেই আইনেই তারা বন্ধ কারখানার জমি অধিগ্রহণ করতে পারে। তা করা হচ্ছে না কেন? মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, তারা অনেক ভোট পেয়েছেন, জনগণ রায় দিয়েছে তাদের পক্ষে, ফলে তারা যা করছেন তার পেছনে জনসমর্থন আছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এককোটি মানুষের স্বাক্ষর নিয়ে রাজ্যপালকে জমা দেব। সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় মহামিছিল করা হবে। একই সাথে জেলায়, থানায়, মহকুমায় বিক্ষোভ চলতেই থাকবে।

৮ জানুয়ারি বিবাদি বাগে জনশূন্য মিনি বাস স্ট্যান্ড

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনের ফাঁসির নামে হত্যার প্রতিবাদে ৩০ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিচার্জ। (ছবি : দৈনিক জাগরণ, বারাণসী)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩২৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in